মুসলিম কবিদের দৃষ্টিতে নারী

(পঞ্চদশ - অষ্টাদশ শতক)

দেবশ্রী মজুমদার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা
২০১৬

Certified that the Thesis entitled

.....

.....

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of

.....

.....

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor :

Dated :

Candidate :

Dated :

ভূমিকা

আমার গবেষণার বিষয় ''মুসলিম কবিদের দৃষ্টিতে নারী (পঞ্চদশ-অষ্টাদশ শতক)''। গবেষণার বিষয় নির্বাচনের কারণ, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণার মূল প্রশ্নগুলি কি এবং কিভাবে তার সমাধানসূত্র খোঁজার প্রচেষ্টা করা হয়েছে সে বিষয়ে যাবার আগে কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের উল্লেখ এখানে করতে চাই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পঠন পাঠনের সময় বিশেষ করে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠ করবার সময় আমার তত্ত্বাবধায়ক পরম শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা ড. সত্যবতী গিরির কাছে আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ক্লাস নিয়মিত করি। মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পর্কিত এক নতুন দ্বার উন্মোচনের মতোই ছিল যেন সেই অভিজ্ঞতা। তাঁর বলিষ্ঠ ও যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণী পদ্ধতি মধ্যযুগের কাব্যের প্রতি প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি করে। এই আগ্রহ থেকেই পরবর্তীকালে মধ্যযুগের সাহিত্য সম্ভার নিয়ে আরও নিবিড়ভাবে পাঠ করবার অনুপ্রেরণা পাই।

অন্যদিকে আরও একটি বিষয় নিয়েও মনের মধ্যে কৌতূহল জাগতে থাকে, তা হল নারীবাদী দর্শন ও তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। এ বিষয়টিকে ভালোভাবে বোঝবার জন্য 'মানবীবিদ্যাচর্চা' নিয়ে এম. ফিল করি। এর ফলে ক্রমশ বুঝতে পারি যে মূলস্রোতের দর্শনের সঙ্গে নারীবাদী দর্শনের এক ধরনের ভাবাদর্শগত পার্থক্য ক্রমবর্ধমান। বাস্তব সমস্যা থেকে উঠে আসা সক্রিয় আন্দোলন থেকেই নারীবাদী তত্ত্ব নির্মিত হতে থাকে। মূলস্রোতের দর্শনের ক্ষেত্রে তা অনেকাংশেই প্রযোজ্য নয়।

সামাজিক উপাদান নিয়ে সৃষ্ট সাহিত্যেও বিভিন্ন প্রকারের লিঙ্গ রাজনীতি লক্ষ করা যায়। অনেক সময় পুরুষ সাহিত্যিকদের রচনায় নারীর অবদমন অধিকমাত্রায় পরিবেশিত হয়। যুগ-কাল-নির্বিশেষে অবদমনের রূপ শুধুমাত্র পরিবর্তিত হতে থাকে।

গবেষণার বিষয় নির্বাচনের মূল কারণগুলি এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক।

প্রথমত, মধ্যযুগের সাহিত্যকে আধুনিক নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়ণ করার একধরণের তাগিদ থেকেই এই বিষয়ের পরিকল্পনা। আলোচনার সুবিধার্থে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক এই সময়ের চৌহদ্দীকে নির্বাচন করা হয়েছে এবং এসময়ের মুসলিম কবির কাব্যের নারীবাদী পাঠ-নির্মাণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রুশতী সেনের লেখা 'প্রচ্ছন্নের আখ্যান' গ্রন্থ থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা হল,

> ''... নারীবাদের নামে জীবনের এবং শিল্পের পুরো জটিলতাকে বুঝতে না-চাওয়াকে আর বেঁচে থাকার সংলগ্ন দুরূহতম সত্যিগুলোকে বানচাল করতে চাওয়াও যেন ক্রমশই একটা বিকল্প বা পরিপূরক অভ্যাস হয়ে উঠেছে।''
>
> (রুশতী সেন, প্রচ্ছন্নের আখ্যান, কলকাতা : থীমা, ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২)

কোনো কাব্যের নারীবাদী পাঠ নির্মাণ করতে গেলে এই সমস্যার সম্ভাবনা থেকেই যায়। সে কারণে মুসলিম কবিদের রচিত কাব্যগুলির নারীবাদী পাঠ নির্মাণের ক্ষেত্রেও দুটি গুরুত্বপূর্ণ

বিষয় খেয়াল রাখতে হয়েছে। নারীবাদের প্রেক্ষিতে কাব্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই যেন তা আরোপিত বলে মনে না করা হয় এবং নারীর অবস্থান সংক্রান্ত বা সামাজিক লিঙ্গ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেন উপেক্ষিত না হয়।

দ্বিতীয়ত মুসলিম কবিদের রচিত কাব্যকে নির্বাচন করার কারণ হিসেবে বলা যায়, কোথাও যেন মূলস্রোতের কিছুটা বাইরে এই কবিরা অবস্থান করেন। আরাকান রাজসভার দুই বিশিষ্ট কবি দৌলত কাজী ও আলাওল ছাড়া অন্যান্য কবিদের কাব্য আজকের তারিখেও খুবই স্বল্পপঠিত।

তৃতীয়ত বর্তমান সমাজে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে এখনও অনেক সময়ই ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হয়। এমনকি তাদের নারী-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিকেও অনেকক্ষেত্রে 'সংকীর্ণ' বলে অভিহিত করা হয়। সাহিত্য তো এক অর্থে সমাজেরই প্রতিবেদন। সাহিত্যের ছাত্রী হিসেবে তাই এই ধারণাকে যাচাই করে দেখবার সামাজিক দায়বদ্ধতা অস্বীকার করা যায় না। মূলত এই তিনটি কারণের বশবর্তী হয়েই এই অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নে মনোনিবেশ করি।

মধ্যযুগের অন্যান্য শাখায় নারী চরিত্রের সামাজিক অবস্থান নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেকে আলোচনা করেছেন। কিন্তু মুসলিম কবিদের কাব্যে বিশেষ করে রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান নিয়ে সম্ভবত এর আগে কেউ গবেষণা করেননি। এই গবেষণাপত্রটি রচনায় বিশ্লেষণাত্মক ও তুলনামূলক গবেষণাপদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয়, তিনি হলেন আমার

তত্ত্বাবধায়ক পূজনীয়া পরম শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা ডঃ সত্যবতী গিরি। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও নিরন্তর উৎসাহদান আমাকে গবেষণাকর্মে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। তিনি তাঁর যথেষ্ট সময় ব্যয় করে ধৈর্যসহকারে প্রতিটি অধ্যায় সংশোধন করে দিয়েছেন এবং উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করেছেন। তাঁর স্বচ্ছ ধারণার মাধ্যমে আমি যথাসম্ভব সমৃদ্ধ হয়েছি। সেজন্য ওঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

গবেষণার কাজে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সাহায্য করার জন্য এবং অনবরত উৎসাহ প্রদান করার জন্য আমি আমার বাবা শ্রী দীপক মজুমদার, মা শ্রীমতী মীরা মজুমদার এবং আমার স্বামী শ্রী শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। এঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জ্ঞাপন করছি।

এছাড়া গবেষণার কাজে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য আমি জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় সরকারের একটি ওয়েবসাইট - Digital Library of India -এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়াও প্রুফ দেখার কাজে আমার মা শ্রীমতী মীরা মজুমদার আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। ওনাকে আমার প্রণাম ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অভিসন্দর্ভটি অক্লান্ত পরিশ্রম সহযোগে টাইপ করে দিয়ে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন শ্রী বিদ্যুৎ পুরকাইত। তাঁকে আমি ধন্যবাদ জানাই। ধর ব্রাদার্স অভিসন্দর্ভটি বাঁধিয়ে দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছে। তাঁদের কাছেও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

দেবশ্রী মজুমদার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ৮

পঞ্চদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত

দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৬

ইসলামের শরীয়ত, মরীফত দর্শন ও প্রাক্-ঔপনিবেশিক বাংলা কাব্য

তৃতীয় অধ্যায় ৬৮

পঞ্চদশ শতকের মুসলিম কবির কাব্যে নারী

চতুর্থ অধ্যায় ১০৮

ষোড়শ শতকের মুসলিম কবির কাব্যে নারী

পঞ্চম অধ্যায় ১৫৯

সপ্তদশ শতকের মুসলিম কবির কাব্যে নারী

ষষ্ঠ অধ্যায় ২১২

অষ্টাদশ শতকের মুসলিম কবির কাব্যে নারী

উপসংহার ২৫৮

গ্রন্থপঞ্জী ২৬১

প্রথম অধ্যায়

পঞ্চদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত

ব্রিটিশ প্রকৃতিবিদ, চার্লস ডারউইন জীবের বিবর্তন নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি 'On the Origin of Species' (২৪ নভেম্বর, ১৮৫৯) নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি লক্ষ করেন যেসব জীবদেহে অভিযোজন মূলক ভেদ (Variation) বর্তমান, তারা অন্যান্য জীবদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে টিকে থাকে। তিনি একে প্রাকৃতিক নির্বাচন বা natural selection আখ্যা দেন। অর্থাৎ তাঁর মতে যেসব প্রকরণ বা ভেদ জীবের জীবন সংগ্রামের পক্ষে সুবিধাজনক, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তারাই কেবল বেঁচে থাকবে ও তাদেরই কেবল উদ্‌বর্তন ঘটবে। কালের নিয়মে বাকিরা পৃথিবী থেকে ক্রমশ অবলুপ্ত হবে। 'On the Origin of Species' গ্রন্থে বলা হয় — "As many more individuals of each species are born than can possibly survive, and as, consequently, there is a frequently recurring struggle for existance, it follows that any being, if it varies however slight in any manner profitable to itself, under the complex and sometimes varying conditions of life, will have better chances of surviving, and thus be naturally selected".[১]

(Charles Darwin, On the Origin of Species, Introduction,

Page - 5 1859, London, John Murray, Albemarle Street).

চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) জীব বিবর্তনবাদের এই সূত্র আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রেই অনেকাংশে প্রযোজ্য। স্যোসাল ডারউইনিজম নামক তত্ত্বটি এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। উনিশ শতকের শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে অনেক সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। 'The "Survival of the Fittest" and the Origins of Social Darwinism' প্রবন্ধে Gregory Claeys সমাজ ও সংস্কৃতিতে ডারউইনের বিবর্তনবাদের মূল চিন্তা - চেতনার বিস্তারের পরিচয় দেন।[২]

আমরাও সমাজের অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রভাব লক্ষ করে থাকি। ইতিহাস মানেই তো সেখানে রাজা - রাজড়ার সাম্রাজ্য বিস্তারের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনি বর্ণিত হতে দেখা যায়। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার ও সবলের ক্ষমতাবিস্তারের ইতিবৃত্তই লিপিবদ্ধ হয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। অবহেলিত থেকে যায় প্রান্তিক বা Subaltern দের রোজ নামচা। ক্ষমতার রাজনীতির বিভিন্ন প্রায়োগিক কৌশল সর্বত্র বিরাজমান থাকে।

বিশ শতকের অন্যতম মৌলিক ফরাসী চিন্তাবিদ মিশেল ফুকোও ক্ষমতার গোপন কাঠামোর সন্ধান করেছিলেন। আমাদের সাধারণ জ্ঞানে ক্ষমতা ব্যক্তি বা সমাজে নিহিত থাকে। ব্যক্তি বা সমাজই আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু ফুকোর ব্যাখ্যা একটু অন্যরকম। তাঁর মতে, ক্ষমতা ব্যক্তি বা সমাজের অধীন নয়, বরং ব্যক্তি বা সমাজই ক্ষমতার মাধ্যম। অর্থাৎ, ক্ষমতা নিজেকে প্রকাশ করে ব্যক্তি বা সমাজের মধ্য দিয়েই। পাওয়ার /

নলেজ সংকলনে ফুকো এটাই বলার চেষ্টা করেছেন তিনি যখন সম্পর্কের কথা বলছেন তখন তার অর্থ এই সমস্ত মানব সম্পর্কের মধ্যে তা সে প্রেমের, প্রাতিষ্ঠানিক বা আর্থ যে সম্পর্কই হোক না কেন সব জায়গাতেই ক্ষমতা উপস্থিত থাকে।[৩]

(প্রসঙ্গসূত্র - Michel Foucault : Power / Knowledge : Selected Interviews and Other Writings, 1972-77, Brighton, 1980)

ডারউইনের জীবের অভিব্যক্তি সংক্রান্ত তত্ত্ব এবং মিশেল ফুকোর ক্ষমতা বিষয়ক তত্ত্ব - এই দুইয়ের প্রথমটি জৈবিক ও দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণরূপে সামাজিক হলেও এই দুটির মধ্যে এক ধরনের সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। তা হল যেকোনো ধরনের প্রতিযোগিতায় সংগ্রাম করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষেরাই। সেই ক্ষমতারই বিভিন্ন রূপ বিভিন্নভাবে ধরা পড়ে। এই ক্ষমতাশীল মানুষেরই জয়গান করা হয় ইতিহাস - সমাজ ও সংস্কৃতিতে। তাই নিম্নবর্গের ইতিহাস কখনোই মূলস্রোতের ইতিহাস হয়ে ওঠে না। Hegemony বা আধিপত্য বিস্তারের মধ্য দিয়েই দিনের পর দিন গড়ে ওঠে ক্ষমতাবানদের আগ্রাসন নীতি সম্বলিত কালানুক্রমিক ইতিবৃত্ত। সমাজের অবহেলিত প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে নারীকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পুরুষশাসিত সমাজ কাঠামোয় নারী দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে সমাজে পরিগণিত হয়। এক্ষেত্রে অনায়াসে বলা যেতে পারে নারীবাদের জন্য নারীবাদের উৎপত্তি বা আবির্ভাব ঘটেনি। বাস্তব সমস্যা থেকেই মুক্তি পাবার প্রয়াস থেকেই পাশ্চাত্য

দেশে এর সূচনা ঘটে। ভোটাধিকার পাওয়া কিম্বা কর্মক্ষেত্রে সমান মজুরি পাওয়ার জন্য নারীমুক্তি আন্দোলনের সূচনা ঘটলেও ক্রমশ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের নারীর অবদমনের সূত্রে গভীর থেকে গভীরতর হয় এর ব্যাপ্তি।

এমনকি History তাই His Story হয়ে ওঠে অধিকাংশক্ষেত্রে, Her story[৪] বা মেয়েদের নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনি সুপরিকল্পিত ভাবে অনুচ্চারিত থেকে যায়। সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর মধ্যে এভাবেই নারীদেরও ফেলা যায়। মূলস্রোত থেকে যারা বেশিরভাগ সময় বিচ্ছিন্ন থেকে যায়।

আমাদের সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণীগত পার্থক্যে ব্যবচ্ছেদ করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় জাতি, ধর্ম, সামাজিক লিঙ্গের নিরিখে বৈষম্য নির্ণয় করা হয়। এছাড়াও ক্ষমতার মাপকাঠিতে বৈষম্য যে নির্ধারিত হয় সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সামাজিক লিঙ্গের বা gender এর প্রেক্ষিতে নারী-পুরুষ বৈষম্য কোনও বিচ্ছিন্ন বৈষম্য সমস্যা নয়। অর্থাৎ এই সমস্যা অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনেক সময় জটিল থেকে জটিলতর রূপ ধারণ করে থাকে। তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতেই পারে যে লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যাটি একমাত্রিক নয়। বহুমাত্রিক এই সমস্যার মূল সমাজের অনেক গভীরে প্রোথিত রয়েছে। এই অনুপেক্ষণীয় বিষয়টি শুধুমাত্র স্থান - কাল- পাত্রের ব্যবধানে প্রকৃতিগতভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে।

আমাদের গবেষণার মূল বিষয়টি হল পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মুসলিম কবিদের কাব্যে নারী। আবার ঐ একই প্রশ্ন উঠতে পারে মুসলিম কবিদের কাব্য নির্বাচন করার উদ্দেশ্য

কি? একইভাবে মূলস্রোতের কথা আরও একবার উল্লেখ করা যায় যে মধ্যযুগের মূলস্রোতের কাব্যধারা বলতে মূলত মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য বা দেব-দেবীর মাহাত্ম্যমূলক কাব্যসমূহকেই বোঝানো হয়। যেগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই হিন্দু কবিদের দ্বারা রচিত হয়েছিল। অন্যদিকে একটি সমান্তরাল কাব্যধারায় রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান রচিত হতে দেখা যায় যা মুসলিম কবিদের নির্মাণ। আপাত ধর্মনিরপেক্ষ এই উপাখ্যানগুলিতে নারী চরিত্রেরও ভিন্নমাত্রিক রূপ পরিলক্ষিত হয়। আপাত ধর্মনিরপেক্ষ বলার অর্থ ধর্ম এখানে প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও মরমীয়া সুফীধর্মের আশেক মাশুক তত্ত্ব কাব্য - কাঠামোর অন্তরালে পরোক্ষভাবে নিহিত ছিল যা পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদে আলোচনা করা হবে। সুফীধর্মের চোরাস্রোত কাব্যগুলির অন্তর্কাঠামোয় লীন হয়ে থাকলেও কাব্যে উপস্থিত নারী চরিত্রদের রক্তমাংসের সামাজিক নারীরূপেই গড়ে তোলা হয়েছে। রূপকের আশ্রয়ে ধর্মতত্ত্বকথা নিশ্চয়ই আছে অনেক ক্ষেত্রে, কিন্তু মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে নরনারীর প্রেম আখ্যান। আর সেই সূত্র ধরেই মধ্যযুগের নারীদের ভিন্নস্তরীয় আততি কাব্যগুলির মধ্য দিয়ে পর্যালোচনা করা যায়। এপ্রসঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাকে হিন্দু কবিদের সৃষ্ট নারী চরিত্রদের মধ্যে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করা যায়। রাধা চরিত্রের উপর কোনোভাবেই দেবত্ব আরোপিত হয়নি। পূর্ণাঙ্গ নারী চরিত্র হিসেবে সে বিরাজমান। মধ্যযুগের নারীর যে সামাজিক অবস্থান, সেই অবস্থান থেকে একমাত্র রাধাই যেন সে যুগের নারী প্রতিনিধি হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

পুনরায় মূল প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বলা যায় যে যুক্তি অনুসারে মূলস্রোতের বিপরীতে

বা প্রান্তিক পর্যায়ে যারা আছে তাদের নিয়েই এই আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে তাদের মধ্যে এক অর্থে মুসলিম কবিদেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ইতিহাস বা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে বলা যায় মুসলিমরা এখনও যেন কিয়দংশে মূলস্রোতের বাইরে অবস্থিত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বলতে প্রথমেই আমাদের মাথায় আসে মঙ্গলকাব্যের কথা। ইউসুফ জোলেখা বা লায়লী মজনুর কথা ক'জন সাধারণ পাঠকের মনে পড়ে? সাহিত্যের ইতিহাসেরই বা কতটুকু স্থানে শাহ মুহম্মদ সগীর বা দৌলত উজীর বাহরাম খাঁর কবি কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়?

বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণ নিঃসন্দেহে এক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এর ফলস্বরূপ সবকিছুই যে খারাপ হয়েছিল এমনটা বাস্তবিক সত্য নয়। তুর্কি অভিযানের ফলে মুসলিম - হিন্দু সংস্কৃতি মেলবন্ধনে এক অখণ্ড সংস্কৃতি গড়ে ওঠবার ভিত্তিভূমি নির্মিত হয়। মুসলিম শাসনের প্রারম্ভেই বাংলায় সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার অনুশীলন পূর্ণ উদ্যমে শুরু করা হয়।

ব্যবসা বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচারার্থে আরব দেশ থেকে অনেক মানুষ তুর্কীদের আসার অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশে আসতে শুরু করে। এর ফলে এখানের মানুষদের সঙ্গে তাদের রীতিমতো ভাবের আদানপ্রদানও শুরু হতে থাকে। বাংলা সাহিত্য চর্চারও এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তবে একথা সত্য যে তুর্কী আক্রমণের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। খিলজী, তুঘলকী, বলবনী প্রভৃতি বিভিন্ন

শাসন ব্যবস্থা এসময় বাংলাদেশে কায়েম হয়। এসময়েও বাংলায় ধর্মপ্রচার করতে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্য থেকে মুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানে ক্রমাগত আসতে থাকেন। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সুফী দরবেশ। এই দরবেশদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মপ্রচার ও ইসলাম ধর্মান্তীকরণ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

গৌড়রাজ্যে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের রাজত্বকালের সময় থেকেই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বিদ্বেষ ও অস্থিরতা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। তিনি ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃত অনুরাগী। তাঁর প্রভাবেই সাহিত্যচর্চার নবদিগন্ত পুনরায় উন্মোচিত হয়। যদিও পঞ্চদশ শতকের পূর্বে এর স্পষ্ট প্রমাণের সন্ধান সেরকমভাবে পাওয়া যায় না।

এসময় মানুষের সামাজিক জীবনের পট অনেকাংশে পরিবর্তিত হল। সমাজে বর্তমান বর্ণবৈষম্য বাইরের আক্রমণের প্রভাবে, নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ল। উচ্চ ও নীচের ভেদাভেদ নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থে খানিকটা হলেও বিলীন হয়ে পড়ল। সুকুমার সেনের মতে, ''মুসলমান সমাজের গোড়ার দিকে সমাজে - এখন হইতে হিন্দু-সমাজ বলা উচিত - ঝাঁকুনির ফলে উঁচু নীচু সমান হইবার সুযোগ মিলিল। মহাযান - উপাস্য অনেক দেবদেবী ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক উপাসনার মধ্যে স্থান পাইল এবং লোপোন্মুখ (তান্ত্রিক) বৌদ্ধ মত ব্রাহ্মণ্য মতের মধ্যে ঢুকিয়া গেল।''[৫]

(পৃষ্ঠা - ৮১, সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ, নবম মুদ্রণ, ২০০৯)

অর্থাৎ নিজ নিজ অস্তিত্ব সংকটের মুহূর্তে শাস্ত্রীয় লৌকিক দেবদেবীর পারস্পরিক সহাবস্থান ঘটল। গ্রাম্য অনেক দেবদেবীই এসময় শাস্ত্রীয় দেবতার মর্যাদা পেল। ধর্মঠাকুর, মনসা, চণ্ডীর পূজা প্রচার যথারীতি দিকে দিকে বিস্তার লাভ করল। এমনকি গৃহস্থ বাড়ীর ব্রত উপবাসের দেবীরাও শাস্ত্রীয় মর্যাদার অধিকার পেল।

এসময়ে ভাষারও একধরণের বিবর্তন লক্ষ করা যায়। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর সরকারী কার্য নির্বাহের ভাষা ফারসী স্থির করা হল। ফারসী ভাষা ধীরে ধীরে সংস্কৃত ভাষার স্থান অধিকার করল। রাজকর্মচারী হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ফারসী ভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য হল। মুসলিম শাসকরা অনেকেই তুর্কী ছিলেন। ফারসী ছিল তাঁদের কাজ চালানোর ভাষা। আইন-কানুনের অনেকক্ষেত্রেই তাই ফারসী শব্দ ব্যবহারের বাহুল্য লক্ষ করা যায়। হিন্দু কবিরা সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাচর্চা করার দরুণ সাহিত্যে ফারসী শব্দবহুল ভাষার অনুপ্রবেশ কিছুটা হলেও বাধাপ্রাপ্ত হয়।

ষোড়শ শতক থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরবর্তীকাল থেকে পুনরায় সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রবণতা শুরু হয়। যদিও রাজকার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে ফারসী শব্দের ব্যবহার এসময়ও প্রচলিত ছিল।

এই সময়ের পরবর্তী শতকে অর্থাৎ সপ্তদশ শতকে পুনরায় ফারসীর ব্যবহার শুরু হয়। বাংলাভাষায় ফারসী শব্দের আধিপত্য এসময় থেকেই চোখে পড়ার মতো। অষ্টাদশ শতকে এসে সপ্তদশ শতকের ন্যায় প্রণয়কাহিনির প্রাণ প্রাচুর্য আর দেখা যায় না। রাজনৈতিক

অস্থিরতা মানবজীবনকেও প্রভাবিত করে। কবিগান, টপ্পা, আখড়াই, হাফ-আখড়াই প্রভৃতির ভাষার মধ্যে কোনো গুণগত উৎকর্ষতা লক্ষ করা যায় না। মুসলিম কবিদের লেখা কাব্যগুলির মধ্যে অষ্টাদশ শতকে দোভাষী রীতিতে রচিত অনেক কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এধরণের কাব্যকে মূলত 'দোভাষী পুথি' বলেই অভিহিত করা হত। বাংলাভাষার সঙ্গে শুধুমাত্র একটি ভাষার মিশ্রণে যদিও একাব্য রচিত হয়নি। অনেকসময়ই একাধিক ভাষা যেমন আরবী ফারসী-তুকী-উর্দু-হিন্দী ইত্যাদি ভাষার সংমিশ্রণে রচিত হত এই দোভাষী পুথিসমূহ। ডক্টর আনিসুজ্জামান তাঁর 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে এধরণের কাব্যকে 'মিশ্ররীতির কাব্য' বলে উল্লেখ করেছেন।[৬]

(ডক্টর আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা - ১১৬)

'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থে যদিও ডক্টর আহমদ শরীফ এধরণের সাহিত্যকে 'দোভাষী সাহিত্য' হিসেবে আখ্যা দেবার কথা বলতে চেয়েছেন।[৭]

(ডক্টর আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, ১ম সং, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা - ৮৭৫)

এই প্রকারের কাব্যের নাম যাই হোক না কেন এই রীতির মাধ্যমে এক ব্যতিক্রমী কাব্যধারার উন্মেষ ঘটেছিল তা স্বীকার করতেই হয়। বিকৃত রুচির কবিগান বা বিভিন্ন ধরনের নাগরিক গান অপেক্ষা এই মিশ্ররীতি বা দোভাষী সাহিত্য বা 'মুসলমানী বাংলা' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহর

মতে) তৎকালীন সময়ে কিছুটা হলেও স্বতন্ত্র ধারার পরিচয় বহন করে।

দোভাষী পুথির আদি কবি ছিলেন ফকির গরীবুল্লাহ। তাঁর কবিকৃতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হবে।

পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের ভাষার ইতিবৃত্ত থেকে পুনরায় মূল বিষয়ে প্রবেশ করে বলা যায় পঞ্চদশ শতকের অব্যবহিত পূর্বে অর্থাৎ তুর্কী আক্রমণের পরবর্তী সময় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের সাহিত্য সম্ভার বলতে তেমন কিছুই পাওয়া যায় না। প্রকৃত সংরক্ষণের অভাবে তা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও পুরোপুরি নাকচ করে দেওয়া যায় না। লোকগান বা ছড়া ব্যতীত এসময়ের কোনো কিছুই তেমন করে পাওয়া যায় না।

পঞ্চদশ শতক থেকে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। রাজনৈতিক দিক থেকেও এসময় বাংলাদেশে বড় রদবদল ঘটে। ১৩৫৮ থেকে ১৪১৩ পর্যন্ত প্রায় নয়জন মুসলমান শাসক এসময় রাজ্য শাসন করেন। ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'দনুজমর্দন দেব' উপাধিপ্রাপ্ত হয়ে রাজা গণেশ গৌড়ে রাজ্যশাসন শুরু করেন। তাঁর রাজত্বকালেও বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল।

গণেশের পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালউদ্দিন নাম নিয়ে গৌড় রাজ্য শাসন করেন। ১৪১৮ থেকে ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যদু রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

অনুমান করা হয় রামায়ণ রচয়িতা, গণেশের রাজ্যশাসন কালে কাব্য রচনা করেছিলেন। আবার অনেক ঐতিহাসিকের মতে তিনি গণেশ পুত্র যদুর সমকালের কবি।

এই দুই ধরনের অনুমানেরই যুক্তি - প্রতিযুক্তি বর্তমান, যার বিস্তারিত আলোচনা মূল গবেষণার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়।

পঞ্চদশ শতকের আরও একজন শিল্প সংস্কৃতি অনুরাগী সম্রাট ছিলেন। তিনি হলেন রুকনুদ্দিন বারবক শাহ। ১৪৫৯ থেকে ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সম্রাটের শাসনকাল। মালাধর বসু রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্যটি এই সময়েই রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ১৪৭৩ সাল থেকে ১৪৮০ সাল এই সাত বছর এই কাব্যটি সমাপ্ত করতে সময় লেগেছিল। ভাগবত ও বিষ্ণু পুরাণ অবলম্বন করে রচিত হয় এই কাব্যটি।

কৃষ্ণকথা বা রামকথাকে আশ্রয় করে এসময়ের হিন্দু কবিরা যখন কাব্য রচনা করছেন, সেই সময় প্রণয় উপাখ্যান রচনার মধ্য দিয়েই মধ্য যুগের মুসলিম কবির প্রথম কাব্যসৃষ্টির সূত্রপাত ঘটে। শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য এ ধরণের প্রথম কাব্য। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মুসলিম কবিদের মানসচেতনা হিন্দু কবিদের থেকে পৃথক প্রকৃতির ছিল। তাই যখন হিন্দু কবিরা ধর্মকেন্দ্রিক ভাবচেতনায় নিবিষ্ট হয়ে একের পর এক কাব্য রচনা করে গেছেন, তখন প্রায় ঐ একই সময়ে মুসলিম কবিরা ভিন্ন স্বাদের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছেন তাঁদের কাব্য। রোমান্টিক প্রণয়গাথাকে আশ্রয় করে তাঁদের কল্পরাজ্য বিস্তৃত হয়েছে। তাহলে সহজেই মনে প্রশ্ন জাগে যে একই সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দুই ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের কবিমানসের পার্থক্যের হেতু কি ছিল? মুসলিম কবিদের কাব্যের মূল বিষয়বস্তু নরনারীর প্রেম-আখ্যান। অন্যদিকে হিন্দু কবিরা ধর্ম মাহাত্ম্যমূলক কাব্য

রচনায় সম্পূর্ণ নিমগ্ন। দু'ধরনের ভিন্ন মানসিকতার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে কেবলমাত্র একটি যুক্তিই মাথায় আসে তা হল দুই ধর্মের কবিদের উপর সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতি ভিন্নমাত্রিক অনুঘটকের মতো ক্রিয়াশীল ছিল। হিন্দু কবিদের বাস্তব অস্তিত্ব বা ধর্মকেন্দ্রিক সংকটের সময় তারা নিজেদের ধর্মের দেবদেবীদের বা আরাধ্য দেবতাদের আকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন। কখনও তা সৃষ্ট হয়েছিল পৃষ্ঠপোষক শাসকদের আনুকূল্যে, আবার কখনও বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর তা নির্ভর করেছিল। অন্যদিকে মুসলিম কবিদের কাছে কাহিনী উৎস হিসেবে কাজ করে গিয়েছিল আরবদেশের বিভিন্ন কিসসা বা হিন্দুস্তানী সাহিত্য। তার ঘটনা অবলম্বনে কিম্বা মৌলিক অনুবাদ কাব্য হিসেবে তাঁরা রচনা করেছিলেন বিভিন্ন রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান। সুফীধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁদের উপর পড়েছিল। তার নির্যাস কখনও বা প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনও বা পরোক্ষভাবে মুসলিম কবিদের কাব্য-কাঠামোয় নিহিত হয়েছিল।

এই দুই ধর্মাবলম্বী কবিদের কাব্যে তাই ভিন্ন মেজাজের দুই ধারার কাব্য রচিত হতে দেখা যায়। একই সমাজে অবস্থান করেও দুটি আলাদা আলাদা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত হয়ে উঠেছিল তাঁদের সৃষ্টিকর্ম।

আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় দুই ধর্মের কবি তাঁদের নিজ নিজ ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন তাঁদের কাব্যে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সম্রাট রুকনুদ্দিন বারবক শাহের আনুকূল্যে মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' ('গোবিন্দ বিজয়'

বা ‘গোবিন্দমঙ্গল’) রচনা করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ ও জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ গ্রন্থে এই কাব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাব্যটির প্রথমদিকে ভাগবতের প্রভাব লক্ষ করা গেলেও শেষের দিকে হরিবংশ অনুসৃত হয়েছে। সুলতান বারবক শাহ কবিকে ‘গুণরাজ খান’ উপাধি দিয়েছিলেন। ব্যাসের স্বপ্নাদেশ পেয়ে কবি কাব্যরচনায় ব্রতী হন। এই রচনাকর্মের উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই কাব্য মধ্যে বলেছেন,

‘‘ভাগবত - অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া।
ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি
তেকারণে ভাগবত গীত ছন্দে গাহি।
কলিকালে পাপচিত্ত হব সব নর
পাঁচালীর রসে লোক হইব বিস্তার।
গাহিতে গাহিতে লোক পাইব নিস্তার
শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার।’’[৮]

(সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস - প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৪)

অন্যদিকে এই সম্রাট রুকনুদ্দিন বারবাক শাহের সভাকবি মুসলিম কবি জৈনুদ্দিনের রচনার বিষয়বস্তুতে এক ভিন্ন স্বাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচিত কাব্যের নাম ‘রসুল

বিজয়।' কাব্যটি রচিত হয়েছিল ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। অনেক গবেষকের মতে আবার 'রসুল বিজয়' বারবক শাহের পুত্র ইউসুফ খানের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল। কারণ বাংলাদেশে রুকনুদ্দিন বারবাক শাহ ১৪৫৯ সাল থেকে ১৪৭৪ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ডক্টর আহমদ শরীফের মতে এই সূত্র ধরে জৈনুদ্দিনকে বারবাক শাহের পুত্র ইউসুফ খানের রাজত্বকালের কবি হিসেবে ধরা যায়।

কাফেরদের বিরুদ্ধে রসুলুল্লাহর যুদ্ধ অভিযানের ইতিবৃত্তই এই কাব্যে স্থান পেয়েছে। রসুলুল্লাহের জীবনের কাহিনীও কাব্যমধ্যে বর্তমান। মুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যপূর্ণ কাহিনীই এই কাব্যের মূল উপজীব্য। বলা বাহুল্য একাব্যে যুদ্ধ সম্পর্কিত নানা অভিযানের কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। মুসলিম কবিদের রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যানগুলির থেকে এই কাব্যের রস ভিন্ন। নারীচরিত্রের মুখ্য কোনো ভূমিকা লক্ষ করা যায় না। এমনকি কাব্যের উপকাহিনীগুলিতেও ওসমান, আলি, হাসান, হোসেন প্রমুখ বীরদের বীরত্বসূচক ঘটনাবলী পরিবেশিত হয়েছে। ইসলামী ঐতিহ্যের রূপরেখা অংকন করার এক অভিনব কৌশল কাব্যটির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হলেও নারীচরিত্র এ কাব্যে প্রায় অদৃশ্য।

এই পঞ্চদশ শতকেরই শেষের দিকে নারীচরিত্রের এক ভিন্ন রূপ দেখা যায় বিপ্রদাস রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যে। ১৪৯৫ - ৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের রাজা হোসেন শাহের আমলে এই কাব্য রচিত হয়। 'শাস্ত্র অনুসার' এ রচনা করলেও এই কাব্যে কবির শিল্পভাবনার সৌকর্য পরিলক্ষিত হয়। লোকসমাজের প্রতিনিধি দেবী মনসা কিভাবে উচ্চ সমাজের প্রতিনিধি চাঁদ

সদাগরকে হেনস্তা করে তার পূজা আদায় করে সেই বিজয় কাহিনীই এখানে বর্ণিত হয়েছে। মনসা যেন একাধারে প্রান্তিক সমাজ ও নারীশক্তির এক পূর্ণমূর্তিরূপে অধিষ্ঠিত। বিয়ের রাতেই তার স্বামী জরৎকারু চলে যান। এর পরবর্তীকালে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য মনসার সংগ্রাম যেন অনেক কালের অনেক নারীর অবিরত সংগ্রামের পুঞ্জীভূত রূপ। জন্ম থেকেই অবহেলার শিকার মনসা। বিয়ের সময় থেকেও স্বামী পরিত্যক্তা। ক্রমাগত না পাওয়ার যন্ত্রণা থেকেই তো প্রতিবাদের, প্রতিরোধের কণ্ঠস্বর দৃপ্ত হয়। মনসা যেন সেদিক থেকে নারীর ক্ষমতায়নের এক আদর্শ দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠেন। এই কাব্যের অপর এক নারী চরিত্র বেহুলাও আপন লক্ষ্যে স্থির, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। বিপ্রদাসের কাব্যের বেহুলা বিদ্যাধরী। সুকুমার সেনের মতে, ''অন্য সকলে বেহুলাকে দিয়া দেবতাদের কাপড় কাচাইয়াছেন এবং দেবসভায় বেহুলাকে বাইজী-নাচ নাচাইয়া ছাড়িয়াছেন। বিপ্রদাস তাহা করেন নাই। তাঁহার রচনায় বেহুলা নেতোর অনুসরণ করিয়া স্বর্গে মনসার লক্ষ্য পাইয়াছে। বেহুলা এখানে নাচনী নয়, সে বিদ্যাধরী - স্বস্থানে ফিরিয়া নিজের প্রতিবেশে আসিয়া স্বভাবতই নৃত্যপর হইয়াছিল। শিবের নাচ দেখা তাহার স্বভাবসুলভ (মনসামঙ্গলে) তরুণীস্পৃহা মাত্র।''[৯]

(পৃষ্ঠা - ১৭৭, সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,
প্রথম খণ্ড, আনন্দ, নবম মুদ্রণ, ২০০৯)

তাহলে দেখাই যাচ্ছে বিপ্রদাস তাঁর কাব্যে দুই ব্যক্তিত্বময়ী নারীচরিত্রকে অঙ্কন করেছেন যারা নিজ উদ্দেশ্য সাধনে দৃঢ় সংকল্প।

রুকনুদ্দিন বারবাক শাহের পরবর্তীকালে হোসেন শাহের আমলেও বাংলা সাহিত্যচর্চা যথেষ্ট সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। হিন্দু মুসলিম উভয় ধর্ম সম্প্রদায়ের কবিগনই তাঁর আমলে স্বচ্ছন্দে বাক্য রচনায় মনোনিবেশ করতে সক্ষম হতে পেরেছিলেন। ১৪৯৩ সাল থেকে ১৫১৯ সাল পর্যন্ত হোসেন শাহ রাজত্ব করেন। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে এই সম্রাটের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে এমনকি হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ এবং তাঁর পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহও হোসেন শাহের ন্যায় সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুপম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, ইতিহাস তা সাক্ষ্য দেয়। হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর নির্দেশেই কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত অনুবাদ করেন। কবির প্রকৃত নাম পরমেশ্বর দাস। নিজেকে তিনি 'কবীন্দ্র' নামে অভিহিত করেন। পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁর আদেশ অনুসারে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ কর্ম সম্পাদন করেন।

এই শতকেরই মুসলমান কবি দৌলত উজির বাহরাম খাঁ 'লায়লী মজনু' নামক প্রণয় - উপাখ্যানটি রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন কবির পূর্বপুরুষ হামিদ খান হোসেন শাহের প্রধান সচিব হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। 'লায়লী মজনু' কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট বিতর্ক বিদ্যমান। ডক্টর আহমদ শরীফের মতকেই স্বীকার করে বলা যায় যে ১৪৪৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৫৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এই কাব্যটি রচিত হয়ে থাকবে।[১০]

(প্রসঙ্গসূত্র - পৃষ্ঠা - ৪১, আজহার ইসলাম, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, আষাঢ়, ১৩৯৯)

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের পূর্বসুরি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের একজন মুসলমান কবির সন্ধান ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে পাওয়া যায়। তিনি হলেন সাবিরিদ খান। বিদ্যাসুন্দর ছাড়াও তিনি আরও দুটি কাব্য রচনা করেছিলেন সেগুলি হল রসূলবিজয় এবং হানিফা ও কয়রাপরী। প্রতিটি কাব্যই খণ্ডিতাকারে পাওয়া গিয়েছে। সাবিরিদ খাঁ তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সুফীতত্ত্বের রূপকে কাব্যের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেছেন।

হোসেন শাহের পরবর্তীকালে আফগানদের রাজত্বকালে বাংলাদেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। এরপর মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার প্রাক্কালেও আফগান ও মুঘলদের পারস্পরিক সংঘর্ষে বাংলাদেশের সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় দেশের কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেকোনো দেশ যখন অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয় তখন সেখানকার সাহিত্য - সংস্কৃতিও সেই অবক্ষয় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চা বাংলাদেশে ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়ে। চট্টগ্রামে - আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে কবিরা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পূর্ণ উদ্যমে কাব্যরচনায় ব্রতী হন।

এই আরাকান রাজসভায়ই দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল প্রমুখ প্রতিভাবান কবিদের কাব্যপ্রতিভার উন্মেষ ঘটতে দেখা যায়। কেবলমাত্র এই দুইজন কবিই নন, কোরেশী মাগন ঠাকুর, মরদন, আবদুল করিম খোন্দকার প্রমুখ কবিরাও রোসাঙ্গ রাজসভায় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে কাব্য রচনা করেছিলেন। মুসলমান কবিদের বাংলায় কাব্যরচনায় এক স্বর্ণযুগ

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আরাকান রাজসভার আনুকূল্যে। দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল প্রমুখ কবিরা রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যানের অনুবাদ কর্ম সম্পাদন করেছিলেন। তাঁরা বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার সঙ্গে অনুবাদ কর্মের প্রাসঙ্গিকতায় আরবী, ফারসী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার যথাসাধ্য মেলবন্ধন ঘটানোর প্রচেষ্টা করেন। পুরোনো কাব্যধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন প্রবাহ সৃষ্টিতে এই কবিদের এক ভিন্ন প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

রোসঙ্গ রাজ থিরি - থু - ধম্মা বা শ্রীসুধর্মার (১৬২২-১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) প্রধান সমর সচিব আশরাফ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় দৌলত কাজী কাব্যসৃষ্টি করেন। সতীময়না, লোরচন্দ্রাণী কাব্যের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়। বলা বাহুল্য এই কাব্যগুলির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সুফীভাবনা ও দর্শনের প্রভাব এসে পড়েছিল। কারণ কবি নিজেই ছিলেন সুফী সাধক। এমনকি আশরাফ খান চিশতী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাই খুব স্বাভাবিকভাবে কাব্যমধ্যে সুফী রূপকের আভাস পাওয়া যায়।

জনপ্রিয় লোককাহিনি বা লোকগাথার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়েই কবি দৌলত কাজী তাঁর লোরচন্দ্রাণী - সতীময়না কাব্যের অনুবাদ কার্যে মনোনিবেশ করেন। ১৬৩৫ থেকে ১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কাব্যটি রচিত হয়। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত লোকগাথা লোরিকমল্লের গাথার মাধ্যমে কবি তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন - এমন অনুমান করা হয়। এমনকি মৌলানা দাউদের মসনবী চন্দায়ন কাব্যের কাহিনীর সঙ্গেও দৌলত কাজীর কাব্যের মিল পাওয়া যায়। তাই বোঝাই যাচ্ছে লোর - চন্দ্রাণীর

কাহিনীর এক ধারাবাহিক ইতিহাস বর্তমান। সুকুমার সেনের মতেও এই কাহিনীর ইতিহাস অনুসরণ করতে গেলে চতুর্দশ শতকের প্রথমদিকে পৌঁছতে হয়। ''জ্যোতিরীশ্বর কবি শেখরাচার্য বর্ণনরত্নাকরে লোরিক - নাচোর উল্লেখ করেছেন। তাঁর সময়ে পূর্ব ভারতের স্থানবিশেষে লোর-চন্দ্রানীর নাটগীত নিশ্চয়ই বেশ প্রসিদ্ধ ছিল।'' [১১]

(পৃষ্ঠা - ২৮, সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য)

কেবলমাত্র লোর - চন্দ্রানীই নয়, সতীময়নার কাহিনীও এক জনপ্রিয় লোক কাহিনী। রাধা কৃষ্ণের প্রেমকাহিনীর মতো এই কাহিনীও তৎকালীন সমাজে প্রচলিত এক কাহিনী।

এই দুই কাহিনীতেই নারী চরিত্রের দুই ধরনের ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে। মধ্যযুগের সমাজ ইতিহাসে নারীর এক ধারাবাহিক অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে এইসব কাব্যগুলি এজন্যই আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। সমাজ থেকে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে কবি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়ে তোলেন কাব্য। কাব্যে তাই কবির কল্পনা থাকলেও তা সম্পূর্ণভাবে বাস্তব জীবন বিবর্জিত হয় না। সেকারণেই তৎকালীন সমাজজীবনে নারীর অবস্থানকে বিশ্লেষণ করতে গেলেও এই কাব্যগুলির মধ্যে থেকে সূত্র অন্বেষণ আবশ্যক হয়ে ওঠে। নারীমনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে তাই এই কাব্যসমূহের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান।

রোসাঙ্গ রাজসভার অপর এক বিদগ্ধ কবি হলেন আলাওল। কবি ফতেয়াবাদ পরগণা অর্থাৎ পণ্ডিতদের মতানুসারে ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, ''আলাওল কবি ফতেয়াবাদ পরগণায় (ফরিদপুর) জালালপুর নামক স্থানের অধিপতি সমসের

কুতুবের একজন সচিবের পুত্র ছিলেন। যৌবনারম্ভে ইনি পিতার সহিত জলপথে গমন করিতেছিলেন। পথে হার্ম্মাদগণ (পর্ত্তুগিজ জলদস্যু) তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে, কবির পিতা যুদ্ধ করিয়া নিহত হন।"[১২]

(দীনেশচন্দ্র সেন - বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পর্ষৎ কর্তৃক তৃতীয় মুদ্রণ, আগষ্ট, ২০০২, পৃষ্ঠা - ৫৬৬)

কবি আলাওল তাঁর পিতৃবিয়োগের পর আরাকান রাজের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। মাগন ঠাকুরের পরামর্শেই তিনি মীর মহম্মদ রচিত পদ্মাবৎ কেচ্ছার অনুবাদ করে 'পদ্মাবতী' রচনা করেন। রোসাঙ্গের রাজা সলেমানের আদেশে আলাওল দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না' কাব্যের বাকি অংশ রচনা করেছিলেন। 'ছয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্যটিও মাগন ঠাকুরের আদেশে তিনি অনুবাদ করেন। কাব্যটির রচনাকালে মাগন ঠাকুরের মৃত্যু হয় এবং দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা আরম্ভ হয়। মুসলিমদের উপর অত্যাচার শুরু হওয়ায় কবিকে মিথ্যা সাক্ষ্যে কারারুদ্ধ হতে হয়। পরবর্তীকালে বৃদ্ধ অবস্থায় তিনি এই কাব্যটি সমাপ্ত করেন। এছাড়াও আলাওল নেজামি গজনবীর 'হপ্তপয়কারের' অনুবাদ করেন এবং বেশ কয়েকটি বৈষ্ণব পদ রচনা করেন।

'পদ্মাবতী' কাব্যে আলাওলের পাণ্ডিত্য ও সুনিপুণ মৌলিক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। জায়সীর পদুমাবৎ কাব্য থেকে এই কাব্যটি অনূদিত হলেও এখানে কবির নিজস্ব

বিশিষ্টতার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের রীতি তিনি কাব্যমধ্যে বারংবার ব্যবহার করেছেন। এ থেকেও তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যবোধ ও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় মেলে। খণ্ডিতা, বাসকসজ্জা, কলহান্তরিতা ইত্যাদি অষ্টনায়িকার ভেদ ও বিরহের দশ অবস্থার বর্ণনা কাব্যে আলোচিত হয়েছে। কাব্যটিতে নারী প্রসঙ্গও ভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়েছে। এদিক থেকেও এই কাব্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। সব ধরনের বিষয় সম্পর্কে কবির পাণ্ডিত্য বৈদগ্ধ্যের এক চূড়ান্ত রূপায়ণ তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্য। এখানে আলাওলের কল্পনাপ্রবণ মনের পরিচয় অধিকমাত্রায় উপস্থিত থাকলেও তাঁর কাব্যগুলির অন্তর্বিশ্লেষণে নারীচরিত্রের বয়ান নির্মাণের নানা মাত্রার সন্ধান করা যায়। আলাওলের কাব্যে সুফী মরমীয়া তত্ত্বের আভাস অন্তর্লীন ছিল। তাঁর রচিত তোহফা কাব্যেও সুফীবাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আলাওল রচিত রোমান্টিক মানবীয় প্রণয় উপাখ্যানগুলি অবলম্বনে নারী চরিত্রের এক আপাত রূপরেখার নিদর্শন কাব্যগুলির মাধ্যমে পাওয়া যায়। অধ্যাত্ম প্রেম-সাধনার অন্তরালেও মাঝে মাঝে রক্তমাংসের নারীর আকুতির যে পরিচয় পাওয়া যায়, নারীর অবস্থানের পাঠ-নির্মাণে তাও কিয়দংশে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রোসাঙ্গ বা আরাকান রাজসভা সপ্তদশ শতকের বাংলা সাহিত্য চর্চার এক পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। দৌলত কাজী, আলাওল ছাড়াও আরও অনেক কবি আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে পেরেছিলেন। এরকমই একজন কবি ছিলেন কোরেশী মাগন ঠাকুর। রোসাঙ্গে রাজা নরপতিগীর (১৬৩৮-১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) অমাত্য

বা প্রধান সচিব ছিলেন তিনি। এই মাগন ঠাকুরই কবি আলাওলের আশ্রয়দাতা ছিলেন। বলা বাহুল্য ইনি হিন্দু ছিলেন না। তাঁর নাম শুনে এরকম বিভ্রান্তি হলেও তিনি আসলে আরব থেকে আগত কোরেশী বংশজাত সিদ্দিকী গোত্রভুক্ত মুসলমান ছিলেন। মাগন ঠাকুর 'চন্দ্রাবতী' কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের কাহিনীও নর-নারীর প্রেম সম্বলিত। চন্দ্রাবতীর সঙ্গে বীরভানের প্রেম কাহিনিই এখানে বর্ণিত হয়েছে। নায়িকাকে পাওয়ার বাসনায় নায়কের বীরত্বপূর্ণ অভিযাত্রায় বিভিন্ন রূপকথা ও বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ ঘটলেও এ থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে যায় যে তখনকার সমাজেও নারীকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় পুরুষের চিরন্তন অদম্য বাসনার চিত্র জনপ্রিয় ছিল। নারীর মানসিক অবস্থারও পরিচয় পাওয়া যায় চন্দ্রাবতীর চরিত্র চিত্রণে যখন কাব্যে দেখা যায় —

''প্রতিদিন কন্যাবতী কন্যা সুচরিতা।
কুমারের রূপধ্যান করে গুণযুক্তা।।''[১৩]

(পৃষ্ঠা - ১৭৪, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি,
আজহার ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯২)

দৌলত কাজী, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর ব্যতীত আরও অনেক মুসলিম কবির রচনা এই শতকে পাওয়া যায় যা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে।

সপ্তদশ শতকে এই মানবীয় প্রণয় উপাখ্যান ছাড়া ধর্মমঙ্গলের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য ধারার বিকাশ এ সময় লক্ষ করা যায় না। পদাবলী সাহিত্যের

ক্ষেত্রে তা পূর্ববর্তীকালেরই অনুগামী। বিষয়বস্তুতে এই শতকের পদাবলী ধারায় নতুন কোনো দিশার পরিচয় পাওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গে মঙ্গল কাব্যের এক বিশেষ ধারা ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিই এই শতকের এক নব সংযোজন। যদিও যে ধর্ম ঠাকুরকে আশ্রয় করে এই মঙ্গলকাব্য রচিত তিনি মোটেই সপ্তদশ শতকের দেবতা নন। বৈদিক দেবতা বরুণ এর সঙ্গে অন্যান্য বৈদিক দেবতার মিশ্রণে গঠিত হয়েছিল এই ধর্মদেবতা। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে মুসলমান শাসনের সময় থেকেই ধর্মপূজা সমাজে প্রচলিত হতে থাকে। আবার লৌকিক বিভিন্ন দেবতার সঙ্গেও এই ধর্মকে মিলিয়ে দেওয়া হয়।

তবে এসময়ের আরও একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য শাখার প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক তা হল পীরমাহাত্ম্য গাথা। মুসলমান পীরও এসময় হিন্দু দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধার্ঘ লাভ করলেন। অনেকসময় সত্যনারায়ণ-এর সঙ্গে পীরের মেলবন্ধন ঘটল। তার ফলে হিন্দু - মুসলমান উভয় সম্প্রদায় তাদের ইষ্টদেবতার প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করে সন্তুষ্ট হল। এধরনের গাথা এক অর্থে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির চিহ্ন বহন করে। গাযী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান এই ধরনের আখ্যান কাব্য। হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর বা নারায়ণের সঙ্গে ইসলামের 'হক্ক মওলা' বা সত্যপ্রভু মিলে মিশে একত্রিত হয়ে সত্যপীর দেবতা নামে লোক সমাজে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতানুসারে, ''সাধারণত হিন্দুর বাড়িতে ইনি সত্যনারায়ণ নামেই পূজা পাইয়া থাকেন — কোথাও বা ইঁহার নাম সত্যপীর। ... মুসলমানের গৃহে ইনি সত্যপীর নামেই গৃহীত হইয়াছেন। হিন্দুরা সত্যনারায়ণ বলিয়া ইঁহার পূজার্চনা করিলেও শীর্ণি-বন্টনে

পুরাপুরি মুসলিম রীতি বজায় রাখিয়াছেন।”[১৪]

(ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,

৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৯৪০)

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই পীরদেবতা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ কোনো কোনো জেলাতেই অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। পীরসাহিত্য সাহিত্যিক উৎকর্ষতার দিক থেকে না হলেও হিন্দু মুসলমান - উভয় সম্প্রদায়ের সমন্বয় সঞ্জাত সাহিত্য হিসেবে ঐতিহাসিক মূল্যের দাবি রাখে।

অন্যদিকে সপ্তদশ শতকের রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যানের ধারা ক্রমশ অষ্টাদশ শতকে এসে স্তিমিত হতে থাকে। সমাজ জীবনও এসময় দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। রাজনৈতিক অস্থিরতা ক্রমাগত প্রবল হয়ে দেখা দেয়। রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, ঘাত-প্রতিঘাত জনমানসকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। ইংরেজ শাসনের অশুভ সঙ্কেতের আগাম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কলকাতা কেন্দ্রিক জীবন যাপনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এক ধরনের বিকৃত নাগরিক গান ও কবিগান জনপ্রিয়তা লাভ করে। মুসলিম কবিদের রচনা বলতে এসময়ে দোভাষী রীতির বা মিশ্ররীতির কাব্য পাওয়া যায়। সে সময়ের ভাষা ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আরবী-ফারসী-তুর্কী-হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিশ্রণে এজাতীয় কাব্য গড়ে ওঠে। ডক্টর আহমদ শরীফের মতানুসারে, ‘‘দোভাষী রীতির উদ্ভব, পরিচর্যা ও বিকাশ ক্ষেত্র, কোলকাতার, হাওড়ার ও হুগলীর বন্দর এলাকা।”[১৫]

(ডক্টর আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড,

পৃষ্ঠা - ৮৮০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩)

অষ্টাদশ শতকের এই রীতির বিখ্যাত মুসলিম কবিরা হলেন ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা প্রমুখ। ফকির গরীবুল্লাহ রচিত 'সোনাভান' কাব্যে বীরযোদ্ধা নারী সোনাভানের বীরাঙ্গনা রূপ সে যুগের নারীর অবস্থান নির্মাণের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, পরবর্তী অধ্যায়ে যা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। এই কাব্যেও পীরসাহিত্যগুলির ন্যায় মুসলিম চরিত্রের সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যা হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্ম সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের ইঙ্গিত বহন করে।

এই যুগের রাজনৈতিক সঙ্কটের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। দেশে অরাজকতার দরুণ অর্থনৈতিক অবস্থাও বিপর্যস্ত হয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধ, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ, ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্বাভাস, দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর - রাজনৈতিক অস্থিরতার চরম দুর্বিপাকে উৎকৃষ্ট মানের সাহিত্য সৃষ্টি কোনভাবেই সম্ভব হয় না। তাই ১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মৃত্যুর পর সেরকম কোনো বলিষ্ঠ কবির সন্ধান পাওয়া যায় না। দোভাষী সাহিত্য ও নিম্নমানের কবিগান প্রভৃতির মাধ্যমেই সেসময়ের পাঠকদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। সামাজিক জীবন যখন বিপর্যস্ত থাকে তখন নারীর অবস্থাও সুখপ্রদ হয় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। অষ্টাদশ শতকের একজন মুসলিম কবি শেখ সাদী, 'গদা মল্লিকা' নামক একটি কাব্য রচনা করেন। ঐ সময়ে নারীকে কি চোখে দেখা হত তা তাঁর রচিত পংক্তিদ্বয়ের মাধ্যমে

সুস্পষ্ট হয় যখন তিনি লেখেন,

''পুরুষ নারীর কথা ধরিয়া চলিব।

পুরুষের কথা কভু নারী না ধরিব।।''[১৬]

(পৃষ্ঠা -২৪২, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, আজহার ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯২)

পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত রচনার সরলীকৃত ও সংক্ষিপ্ত প্রয়াস নির্মাণের প্রচেষ্টা করা হল মাত্র। এই চারশতকে বাংলায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশি উত্থান-পতন, নানা ধরনের টানাপোড়েন লক্ষ করা যায়। ইতিহাসের পাতায় তা ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই অধ্যায়ের পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও ঐ একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই চার দশকের মুসলিম কবির কাব্যে নারীর অবস্থান বোঝার পাঠ নির্মাণের প্রাসঙ্গিকতায় যতটা উল্লেখ করা আবশ্যক তার উপর ভিত্তি করে এক সরল রূপরেখা অঙ্কনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্যপঞ্জী

১. Charles Darwin, On the Origin of Species By Means of Natural Selection (London : John Murray, Albemerle Street, 1859), Introduction Page 5

২. Gregory Claeys, The “Survival of the Fittest” and the Origins of Social Darwinism, Source : Journal of the History of Ideas, Vol. 61, No. 2, April, 2000, University of Pennsylvania Press, Page 223-240.

৩. Michel Foucault, Power / Knowledge : Selected Interviews and Other Writings, 1972-77, Brighton, 1980.

৪. র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিস্টদের মধ্যে অনেকে History অর্থাৎ His Story যেখানে শুধুমাত্র পুরুষদের বীরত্বের কালানুক্রমিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকে, তার বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে Historyতে Her story অর্থাৎ মেয়েদের কাহিনী অনুপস্থিত থাকে।

৫. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (কলকাতা : আনন্দ, নবম মুদ্রণ, ২০০৯), পৃষ্ঠা ৮১

৬. ডক্টর আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, (ঢাকা : প্যাপিরাস, ১৯৬৪), পৃষ্ঠা ১১৬

৭. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩), পৃষ্ঠা ৮৭৫

৮. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৪ (Secondary reference)।

৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৭

১০. আজহার ইসলাম, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, আষাঢ় ১৩৯৯) পৃষ্ঠা ৪১

১১. সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৌষ ১৪০০) পৃষ্ঠা ২৮

১২. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পর্ষৎ কর্তৃক তৃতীয় মুদ্রণ, আগষ্ট ২০০২), পৃষ্ঠা ৫৬৬

১৩. আজহার ইসলাম, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৪

১৪. ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড (কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিডেট, ২০০১), পৃষ্ঠা ৯৪০

১৫. ডক্টর আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩) পৃষ্ঠা ৮৮০

১৬. আজহার ইসলাম, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪২

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের শরীয়ত, মরীফত দর্শন ও প্রাক্ ঔপনিবেশিক বাংলা কাব্য

মধ্যযুগের যেকোনো সাহিত্য - নির্মাণের পশ্চাদপটে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। ভক্তি আন্দোলনের প্রভাবে বাংলায় পদাবলী সাহিত্য, জীবনী কাব্য, নাটক রচিত হয়েছিল। অন্যদিকে মুসলিম কবিদের রচিত কাব্যেও সুফী ধর্ম ও দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাব এসে পড়েছিল। এমনকি তাঁদের দ্বারা রচিত রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যানগুলির কাহিনী উৎস অনেক সময়ই ইরানের সাহিত্য। সুফী ভাবধারা ও দর্শন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল ইরাণী সুফী কবিদের কাব্য। মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনই ছিল সুফী ধর্মের মূল তত্ত্ব। মরমীয়াবাদী সুফীকবিরাও আল্লাহর সঙ্গে মানুষের প্রেমের সম্পর্ককেই তাঁদের কাব্যের অন্তর্কাঠামোয় স্থান দেন। আশেক-মাশুক তত্ত্বের রূপক তাঁদের কাব্যে অন্তর্লীন হয়ে থাকে। বাংলার মুসলমান কবিরাও এই ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে কাব্য রচনায় নিবিষ্ট হন। আমাদের মূল উদ্দেশ্য তাঁদের কাব্যে উপস্থিত নারী চরিত্রদের অবস্থানের বয়ান নির্মাণ করা। কিন্তু তার পূর্বে মুসলিম কবিদের কাব্যরচনার তত্ত্বকাঠামোকেও বুঝে নেওয়া আবশ্যক।

বাংলাদেশে মুসলিম বিজয়ের আগে সুফীরা এসেছিলেন কিনা এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা বিতর্ক রয়েছে। Elliot & Dawson এর লেখা 'History of India' গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত সূত্র অনুযায়ী ময়নামতী ও পাহাড়পুরের আব্বাসীয় খলিফাদের দ্বারা ব্যবহৃত মুদ্রা থেকে এবং বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে অনুমান করা যায়, আনুমানিক অষ্টম শতক থেকে আরবদের সঙ্গে

বাংলার বাণিজ্য সম্পর্কিত আদান প্রদান শুরু হয়। কিন্তু একথা হলফ করে বলা যায় যে ইসলামের সুফীবাদ তখনও প্রবর্তিত হয়নি। যে মুসলিমরা তখন বণিকরূপে এসেছিলেন তাদের ধর্ম বলতে ইসলামের শরীয়ত ধর্মকেই বোঝানো হয়। ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নয় চট্টগ্রাম প্রভৃতি বন্দরে আরবজাতি মূলত বাণিজ্য করবার প্রয়াসেই বারংবার আগমন করত।[১]

আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় মরীফত দর্শন অর্থাৎ ইসলামের সুফী মতবাদ। এবিষয়ের গভীরে অনুপ্রবেশের পূর্বে ইতিহাসের হাত ধরে একবার অতীতের দিকে মুখ ফেরাতেই হয়। সুফীবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে গেলে অনেকগুলি মতবাদের কথা মাথায় রাখতে হয়, সেই বিষয়টিও আপাতত মুলতুবি রেখে আমরা ইসলাম ধর্মের শরীয়ত বিষয়ক আলোচনা সংক্ষিপ্তাকারে করব।

প্রাচীনকালে আরবজাতি অত্যন্ত উন্নত ও সংস্কৃতিবান ছিল। প্রাচীনকাল বলতে যীশুখ্রীস্টের জন্মেরও কয়েক শতাব্দী পূর্বের কথা বলা হচ্ছে।

আরব দেশ বলতে তখন এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে পারস্য উপসাগর, ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর, 'হলব' অঞ্চল প্রভৃতি দিয়ে আবেষ্টিত ভূখণ্ডকে বোঝাত। এখানকার মানুষেরা তখন মূলত পশুপালন নির্ভর জীবন নির্বাহ করত। ফিলিস্তিনি ভাষায় অরবত বলতে মরুভূমিকে বোঝানো হত। এই শব্দ থেকেই আরব শব্দের উৎপত্তি হয়। ফিলিস্তিন অঞ্চলে কৃষিকার্যও প্রচলিত ছিল। স্থানে স্থানে সোনার খনি থাকার দরুণও এই জাতি অর্থকরী দিক থেকে ধনী হয়ে ওঠে। শিল্পকলার দিক থেকেও তারা ধীরে ধীরে উন্নত

হয়। প্রাচীন ভগ্নাবশেষ ও শিলালেখ থেকে যার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু 'নাবত' জাতির আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে আরব সভ্যতার ধীরে ধীরে অবক্ষয় ঘটে। সর্বদিক দিয়ে তাদের স্খলন ঘটে। অবক্ষয়িত সামাজিক প্রতিবেশে মানুষের চারিত্রিক স্খলনও অনিবার্য হয়ে ওঠে - ইতিহাসে তার সাক্ষ্য বারবার পাওয়া যায়। আরব জাতির ক্ষেত্রেও তার অন্যথা ঘটেনি।[২]

এরকম সময়েই ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে মক্কাতে হজরত মহম্মদের জন্ম হয়। তাঁর জন্মগ্রহণের পূর্বেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। শিশুকালেই মহম্মদের মাতৃবিয়োগ ঘটে। এমতাবস্থায় প্রায় একমাত্র অবলম্বন পিতৃব্য আবু তালিবের সঙ্গেই মুহম্মদ দেশান্তরে বাণিজ্য করতে বের হন। অক্ষরজ্ঞানহীন মুহম্মদ এক অবস্থাপন্ন মহিলা খাদিজাকে বিবাহ করেন। খাদিজা ইহুদি ধর্মের অনুগামী ছিলেন ও তিনি মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী ছিলেন না। বাণিজ্যের কারণে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের সময় মুহম্মদ একেশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজা বিরোধের অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত হন এবং বৈবাহিক সূত্রে স্ত্রীর দ্বারাও মূর্তিপূজার বিপক্ষের ধারণালব্ধ হন।[৩]

জিব্রাইলের সঙ্গে সাক্ষাতে মুহম্মদ এক নবজীবনের দিশা খুঁজে পান এবং তখন থেকেই তাঁর পয়গম্বর জীবনের সূত্রপাত ঘটে। অন্যদিকে মূর্তি পূজারীদের অত্যাচারী রূপও তাঁকে একেশ্বরবাদের সমর্থনপুষ্ট করে তোলে। বহু দেবতার পূজার পরিবর্তে একেশ্বর অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উপাসনার উপদেশ প্রদানই মুহম্মদের জীবনের প্রধান সাধনা হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর এই দিব্য উপদেশের একত্রিত সংগ্রহমালাই হল ইসলাম ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'কোর আন শরীফ'। মুহম্মদ তাঁর জীবনের ৪০ বছর বয়স থেকে ৬৩ বছর বয়স পর্যন্ত অধ্যাত্ম বিষয়ক যে বক্তব্য

পেশ করেছিলেন তার সম্মিলিত রূপই হল কোরান। এই গ্রন্থ ১১৪টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। যার কিছু অংশ তিনি মক্কাতে এবং অবশিষ্টাংশ মদিনাতে ব্যক্ত করেছিলেন। বলা বাহুল্য, হজরত মহম্মদের সময়ে তাঁর মুখ নিঃসৃত কোরান, বর্তমানকালে প্রাপ্ত কোরানের থেকে অনেকাংশেই পৃথক ছিল। যদিও তাঁর জীবৎকালে তাঁর বলা প্রত্যেকটি বাক্যই অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে লিখে রাখা হত। পরবর্তীকালে চতুর্থ খলিফা ওসমান সমগ্র কোরান শরীফকে সংকলিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার তাগিদ বা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।[৪]

হজরত মহম্মদ তাঁর শত্রুপক্ষ কুরেশীয় পুরোহিত সম্প্রদায়ের অত্যাচারে মক্কা পরিত্যাগ করে মদিনায় চলে যান। তাঁর এই মদিনায় থাকার দিন থেকে মুসলিমদের হিজরি সম্বতের সূচনা হয়।

মদিনায় বসবাস কালে মুহাম্মদ ইহুদি ধর্ম এবং খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীদের সাহচর্যে আসেন। এই দুই ধর্মের মানুষই মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। দুই ধর্মের প্রতিই তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্ম কিভাবে বিশ্বের এক স্বতন্ত্র ধর্মে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তার অন্তর্নিহিত বিস্তারিত ইতিহাসে আমরা এই স্বল্প পরিসরে যাব না। কারণ তা মূল গবেষণা বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

ইসলামের শরীয়ত দর্শনের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে প্রকাশ করা এবং সুফীধর্ম বা মরমিয়া দর্শন কিভাবে বিবর্তিত হয়ে প্রাক্ ঔপনিবেশিক বাংলা কাব্যে তার প্রভাব বিস্তার করে তা

অনুসন্ধান করাই এই অধ্যায়ের মূল উপজীব্য।

'ইসলাম' শব্দের অর্থ শান্তি। এই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল শান্তি বা সত্যের অন্বেষণ। যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসরণ করেন, তাদের প্রকৃত শান্তির পথ বা রাস্তা প্রভু নির্দেশ করেন এবং অন্ধকার থেকে আলোর পথে চালনা করাই ইসলাম ধর্মের মূল অন্বিষ্ট।[৫]

(৬:৪:৪০, পবিত্র কুরআন, বাংলা অনুবাদ, বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা, মে, ২০১২)

এই সত্যের পথে, মোক্ষের পথে পৌঁছনোর জন্য শরীয়তি ইসলামে চারটি প্রধান ধর্মীয় কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে।[৬] উপবাস করা বা রোজা রাখা — রমজান মাসে মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাসে থেকে সংযমী জীবন যাপন করে। একে সোমও বলা হয়ে থাকে। প্রার্থনা বা নামাজ পড়াও মুসলিমদের অবশ্য কর্তব্য। একে সলাত বলা হয়। কোরান শরীফে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ করার কথা না থাকলেও প্রায় সকল মুসলিম ধর্মের মানুষই দিনে পাঁচবার নমাজ পড়বার প্রচেষ্টা করে থাকেন। নমাজের আগে প্রত্যেককেই পরিশুদ্ধ হতে হয় যাকে 'ওজু' (অঙ্গ-শুদ্ধি) বলা হয়।

রোজা, নমাজ ছাড়া ইসলাম ধর্মের তৃতীয় ধর্মীয় কর্তব্য হল হজ বা কাবা যাত্রা। আরবের মক্কা নগরে কাবা নামক প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। কাবাকে মন্দির বলে অভিহিত করার উদ্দেশ্য হল প্রাচীনকালে এটিকে মন্দির নামেই উল্লেখ করা হত। বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী এই মন্দির দর্শনে প্রতি বছর আসত। হজরত মুহম্মদের জন্মের প্রায়

ছয়শত বৎসর পূর্বের কথা এখানে বলা হচ্ছে।

পরবর্তীকালে হজরত মুহম্মদের সময় থেকেই কাবা মন্দির ক্রমে ক্রমে মসজিদ বা ইসলাম ধর্মের মানুষদের উপাসনাগৃহে পরিণত হয়। কোরান শরীফে এই কাবা মসজিদ সম্পর্কে বলা হয়েছে — ''ঈশ্বর পবিত্র প্রথম ঘর, কাবাগৃহ নির্মাণ করেছেন। ঈশ্বর মহানুভব এবং জ্ঞানীদের জন্য এই উপদেশ।''

নির্দিষ্ট সময়ে কাবা যাত্রা করাকে হজ বলা হয় এবং বছরের অন্যান্য সময়ে কাবা যাত্রাকে বলা হয় উমরা।[৭]

[(২:১৯:১৫৮), কোরআন শরীফ - প্রাগুক্ত]

এই হজ করার সময় রোজা পালনের বিধিসম্মত নিয়মকানুন আছে তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে করা হল না।

রোজা, নমাজ, হজ ছাড়াও আরও একটি কর্তব্য ইসলাম ধর্মে পালন করতেই হয় তা হল জাকাত বা দান। গরীব-দুঃখী, অনাথ, ভিক্ষুক প্রভৃতি সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীকে মুক্ত হস্তে জিনিসপত্র দান করার মতো পুণ্য কাজ ইসলাম ধর্মে বিধিসম্মত।

এই চারপ্রকারের ধর্মীয় কর্তব্য ছাড়াও ইসলাম ধর্মে কোরবানি বা বলিদান অবশ্য কর্তব্য ছিল।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আলোচনার সময় যে শরীয়ত শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হয় তার প্রকৃত স্বরূপ কি। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের একমাত্র আরাধ্য খোদা বা

আল্লাকে তাদের আইন রচনাকার হিসেবে মেনে নিলে, তাঁর বন্দেগী করতে আরম্ভ করলেই, ধরে নেওয়া হয় রসূল খোদার পক্ষ থেকে আইন প্রণয়ন করতেই এসেছেন। আল্লা বা খোদার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য যেভাবে চলতে হয় তারই নাম শরীয়ত। এই পথ ও পথে যাবার পন্থাও খোদাতাল্লা রসূলকে বলে দেন। সময়ের সাথে সাথে ব্যক্তিভেদে শরীয়তের বহু পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু দ্বীনের কোনো ভেদ কখনো ঘটেনি। কোরআন শরীফ অনুযায়ী আল্লাহর কাছে সেটাই হল দ্বীন যার মাধ্যমে মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহতালাকেই সর্বশক্তিমান বলে ধার্য করে এবং তিনি ভিন্ন অন্য কারো সামনে নিজেকে নত করে না। শুধুমাত্র আল্লাহকেই মালিক, মনিব, রাজাধিরাজ বলে মানতে হবে এবং তিনি ছাড়া কারও দাসত্ব গ্রহণ করা চলবে না।[৮] সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী রচিত 'ইসলামের হকীকত' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

''শুধু আল্লাহকেই হিসাব গ্রহণকারী এবং কাজের উপযুক্ত প্রতিফলদাতা মনে করিবে এবং তিনি ছাড়া কাহারো নিকট হিসাব দেওয়ার পরোয়া করিবে না। 'দ্বীনের'-ই নাম হইতেছে ইসলাম। কোন মানুষ যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও আসল শক্তিমান, আসল আইন রচয়িতা, আসল বাদশাহ ও মালিক, প্রকৃত প্রতিফলদাতা মনে করে এবং তাহার সম্মুখে বিনয়ের সহিত মাথা নত করে, যদি তাহার বন্দেগী ও গোলামী করে, তাহার আদেশ মত কাজ করে এবং তাহার প্রতিফলের আশা ও শাস্তির ভয় করে, তাহা হইলে উহাকে মিথ্যা 'দ্বীন' মনে করিতে হইবে। আল্লাহ এমন দ্বীন কখনো কবুল করিবেন না। কারণ ইহা প্রকৃত সত্যের

সম্পূর্ণ খেলাফ। এই নিখিল পৃথিবীতে আসল শক্তিমান ও সম্মানিত সত্তা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারো কোন আধিপত্য নাই, বাদশাহী নাই। আর মানুষকে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারো বন্দেগী ও গোলামী করিবার জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। সেই আসল মালিক ছাড়া কাজের প্রতিফল দেওয়ার ক্ষমতা কাহারো নাই।"[৯]

(ইসলামের হকীকত, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কোলকাতা, অক্টোবর, ২০১২, পৃষ্ঠা -৫১)

বলা হয় দশজন মুসলমান যদি দশটি নিয়মে তাদের কার্য নির্বাহ করে যতক্ষণ তারা শরীয়তকে মান্য করে চলবে ততক্ষণ তারা সকলেই প্রকৃত মুসলমান। এই হল অতি সংক্ষেপে ইসলামধর্মের রূপরেখা সম্পর্কিত ধারণা।

এই অধ্যায়ের পরবর্তী পর্ব সন্নিবদ্ধ হবে ইসলামের মরীফত ধর্ম বা মরমীয়া দর্শন সুফী ধর্মকে কেন্দ্র করে।

মানবজাতির ধর্মসাধনার পথ বৈচিত্র্যময়। হিন্দুধর্মের মরমীয়া ধর্ম বলতে যেমন বৈষ্ণব ধর্মকে বোঝায়, তেমনই মুসলিম মরমীবাদ সুফীবাদ, সুফীতত্ত্ব, তাসাউফ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত।

সুফীবাদের মূল তত্ত্বে যাবার আগে জেনে নেওয়া প্রয়োজন 'সুফী' এই শব্দটির উৎস। অনেকে মনে করেন এই শব্দটি আরবী শব্দ 'সাফা' থেকে এসেছে যার অর্থ হল পবিত্রতা।

কেউ কেউ আবার সুফী শব্দটি 'সাফ্‌ফ' থেকে উৎপন্ন বলে অনুমান করেন। 'সাফ'-এর অর্থ পংক্তি বা শ্রেণী। সেই অর্থ ধরনে সুফী বলতে প্রথম শ্রেণীর মানুষকে বোঝায়। অর্থাৎ যারা আল্লাহ বা একেশ্বরের কাছে যোগ্য মর্যাদার অধিকারী। কেউ কেউ গ্রীক শব্দ 'সোফিয়া' অর্থাৎ জ্ঞান থেকে সুফী শব্দের উৎপত্তির কথা স্বীকার করেন। অনেক চিন্তাবিদের মতে আবার 'সুফ' শব্দ থেকে 'সুফী' এই কথাটি এসেছে। 'সুফ' এর অর্থ হল পশম। এই উৎসমূল অনুযায়ী পশম বস্ত্র পরিহিত ব্যক্তিদের সুফী বলা যায়। হজরত মুহম্মদ বিলাসিতা বিরোধী ছিলেন। পশম বস্ত্র অনাড়ম্বরতার প্রতীক। যারা অত্যন্ত সরল ও সাদাসিধাভাবে জীবন যাপন করত এবং পশম বস্ত্র পরিধান করত তাদেরকেও সুফী বলা হয়।[১০]

আমাদের এই সব ধরনের সম্ভাবনার কথাই মাথায় রাখতে হবে।

মরমী সাধকেরা সর্বক্ষেত্রেই হৃদয় অনুভূতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অন্তরের আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়ে তারা যেন মনের মানুষকে অন্বেষণের অন্তরালে ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রচেষ্টা করেছেন। সুফীরাও এই বোধেরই অনুসারী। শরীয়ত যেমন তার নানাবিধ নিয়মকানুন নিয়ে পরিবেষ্টিত, সুফীবাদে সেই আষ্টে-পৃষ্ঠে বাধা নিয়ম নেই। তাদের কাছে আল্লাহ প্রেমময়। প্রেমের মাধ্যমেই পরমসত্তার সঙ্গে মানবসত্তার মিলন হওয়া সম্ভব।

ইসলাম ধর্ম থেকেই সুফীবাদের যে উৎপত্তি হয়েছে একথা আজ সর্বজনবিদিত। কিন্তু এ নিয়েও প্রাথমিক পর্যায়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল। বিভিন্ন পাশ্চাত্য দার্শনিক-এ ব্যাপারে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছিলেন। সুফীবাদের উৎস সম্পর্কে এধরণের চারটি

মতবাদ আপাতভাবে পাওয়া যায়।

প্রথমটি হল বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের মতবাদ — এইচ মর্টন ও গোল্ড জীহর এই মতবাদের সমর্থক। এঁদের যুক্তি অনুযায়ী সুফীবাদ বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন থেকে এসেছে। ইসলাম ধর্মের মানুষ ভারতবর্ষে এসে বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং এই দ্বিবিধ দর্শন তাদের যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করে।

(ড: রশীদুল আলম, সুফী সাধনার ভূমিকা, আয়েশা কিতাব ঘর, ঢাকা, ২০০২)

দ্বিতীয় মতবাদটি হল নিও প্লেটোনিক খ্রিষ্টীয় ধর্মের প্রভাবে মতবাদ — নিকলসন, ভনক্রেমার — পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা মনে করেন — মুসলিমরা যখন নিও-প্লেটোনিক খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষদের সংস্পর্শে আসেন, তখন তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সুফীবাদের ধারণার সূত্রপাত করেন।

সুফীবাদের উৎপত্তির মতবাদের তৃতীয়টি হল পারসিকদের প্রভাবের মতবাদ। এই মতবাদ অনুযায়ী আবার মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা পারসিকদের কাছ থেকে ধারণা প্রাপ্ত হয়ে সুফীবাদের উন্মেষ ঘটান।

সর্বশেষ এবং সবচেয়ে জোরালো মতবাদটি হল শরীয়ত - কোরানের মতবাদ। কোরানের মূল যে দর্শন সেইখান থেকেই সুফীবাদের উৎপত্তি ঘটেছে এই মতবাদ তাকেই সমর্থন করে। এই মতবাদের সপক্ষের যুক্তি হিসেবে বলা যেতে পারে কোরানের বিভিন্ন

আয়াতে এর প্রমাণ লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। সুফীবাদ যে ইসলাম ধর্মের গূঢ় অধ্যাত্মিক ও মরমীয়া উপাদানের স্বাভাবিক পরিণতি, কোরানই তার প্রামাণ্য দলিল। আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠা, আনুগত্য, প্রেম এ সমস্তই যেন প্রেমাষ্পদের প্রতি প্রেম দিয়ে প্রতিক্ষেপন করা যায়।[১১]

(প্রসঙ্গসূত্র : ড: রশীদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত)

সুফীধর্মে চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য কয়েকটি পর্যায়ক্রম আছে। সেই স্তরগুলি লক্ষ করলেও বোধগম্য হয় যে ইসলাম ধর্ম থেকেই জাত এই সুফীধর্ম।

আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সুফীদের অনেকগুলি আত্মিক স্তর অতিক্রম করতে হয়। এগুলি হল যথাক্রমে শরীয়ত, তরিকত, মারেফাত ও হক্কীকত। এর মাধ্যমে তাদের আত্মার প্রসার ঘটে এবং তারা সহজেই পরম আরাধ্যের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। প্রথম স্তরটি হল শরীয়ত। সুফীর যাত্রার সূচনা ঘটে শরীয়তের বিভিন্ন বিধি নিয়ম অনুশীলনের মধ্য দিয়েই। সুফীসাধক নমাজ, রোজা, হজ, জাকাত প্রভৃতি কঠোর নিয়ম পালন করেই তার আধ্যাত্মিক যাত্রাপথের প্রস্তুতি পর্বের সূচনা করেন। শরীয়তের নানাবিধ নিয়ম নিয়েই পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক স্তরটি হল তারিকত। শরীয়তের বিধান অনুশীলনের পরেই সে এই স্তরে উন্নীত হতে সক্ষম হয়। প্রথম স্তরটির থেকে এই স্তরটি অধিক উন্নত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই পর্বে মুর্শিদ বা আলোকপ্রাপ্ত অধ্যাত্ম গুরুর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়। তাঁর দ্বারা জ্ঞান, বোধ, নিষ্ঠা, আধ্যাত্মিকতা - সবক্ষেত্রের পাঠই সুফীসাধক গ্রহণ

করতেন। সব নিয়মকানুন মেনে মুর্শিদকে প্রসন্ন করতে সক্ষম হলেই তিনি মুরিদ হবার যোগ্যতা পেতেন। এই অবস্থানকে 'ফানায়ে শেখ' বলে গণ্য করা হয়।

মারেফাত হল এই যাত্রাপথের তৃতীয় স্তর। এই স্তরকে আধ্যাত্মিক আলোকের স্তর বলা হয়। সৃষ্টির গভীর রহস্য উদ্ঘাটন করাই এই স্তরের মূল উদ্দেশ্য। মানব জীবনের তুচ্ছতা অতিক্রম করে ঐশী আলোকে আলোকিত হবার জন্য সুফীর হৃদয় ভাবালোকে বিভোর হয়ে থাকে। এই স্তরে সুফী সাধকের হৃদয় আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণভাবে নিবেদিত হয়। জাগতিক চিন্তা-ভাবনার অনেক উর্দ্ধে আরোহন করে তাঁর হৃদয়ের সমগ্র সত্তা। সুফী-হৃদয়ের সবকিছুই উৎসর্গ করা হয় তার পরম আরাধ্য আল্লাহর প্রতি।

চতুর্থ বা শেষ স্তরটি হল হক্কীকত। পরম সত্যকে উপলব্ধি করাই এই স্তরের প্রকৃত লক্ষ্য। সবরকমের পার্থিব প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়াই এই চরম পর্বের পরম প্রাপ্তি। নিজের অস্তিত্বকেও অগ্রাহ্য করে প্রেমধর্মের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণই এই স্তরের মূল আকাঙ্ক্ষিত চরম লক্ষ্য। এই স্তরের নাম 'ফানাফিল্লাহ'। এসময় সুফীর নিজের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়।[১২]

আল্লাহর প্রতি প্রেমই সুফীবাদের মূল বৈশিষ্ট্য। পার্থিব কোনো চিন্তা-ভাবনাই সুফীর সঙ্গে আল্লাহর দূরত্ব সৃষ্টি করে না। তাদের হৃদয় সর্বদা ঈশ্বর প্রেমে নিমজ্জিত থাকে। নিজের ব্যক্তিগত কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে না। সবকিছুই আল্লাহর জন্য উৎসর্গীকৃত হয়।

দশম শতক থেকে সুফীদের নানাবিধ অনুশীলকে নিয়ন্ত্রণ করার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন

ধরনের তারিকার সৃষ্টি হয়। সুফী পীর বা দরবেশরাই আধ্যাত্মিক গুরু বা সিদ্ধ মুর্শিদ রূপে কার্যনির্বাহ করা শুরু করেন।

বিভিন্ন ধরণের বা বিভিন্ন মতবাদের সুফীবাদের উল্লেখ করা যায়। বিখ্যাত কয়েকটি সুফীবাদের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল[১৩] —

১. চিশতী — দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে আজার বাইজান-এর ঝনঝন শহরের সুফী সাধক শেখ হোসাইন লাহোরে এসে চিশতী তরিকার প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। শোনা যায় এই শেখ হোসাইন-ই তাঁর শিষ্য মঈনউদ্দিন চিশতীকে ভারতবর্ষে সুফী মতবাদ প্রচারের আদেশ দিয়ে যান। চিশতী বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং সুফী দর্শন নিয়ে বহু জ্ঞান অর্জন করেন। শেষে তিনি আজমীরে অবস্থান করেন। তাঁকেই ভারতবর্ষের ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক হিসেবে গণ্য করা হয়।

২. কাদেরীয়া — সুফীবাদের বিখ্যাত কয়েকটি মতবাদের মধ্যে কাদেরীয়া মতবাদ অন্যতম। হজরত আব্দুল কাদের জিলানী এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। পারস্যের জিলান প্রদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন আব্দুল কাদের জিলানী একজন বিখ্যাত সুফী সাধক ছিলেন। তিনি অনেক ইহুদী ও খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। এই মতবাদের নিয়ম অনুসারে আল্লাহর নাম স্পষ্টরূপেও থেমে থেমে বার বার উচ্চারিত হয়।

৩. সোহরাওয়ার্দী — খাজা মঈনউদ্দীন চিশতীর সমসাময়িক কালে আরেক ধরনের সুফী মতবাদও চরম জনপ্রিয়তা লাভ করে সেটি হল সোহরাওয়ার্দী মতবাদ বা তরিকা। বাগদাদের

শেখ সোহরাওয়ার্দির জন্ম ১১৪৭ সালে ও মৃত্যু ১২৩৪ সালে। তিনি মুরিদদের সুফী মতবাদে আলোকিত করার জন্য 'আদাবুল মুরিদিন' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরাক প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে সোহরাওয়ার্দী তরিকা অনুসরণকারী মানুষদের পরিচয় পাওয়া যায়। চিশতী তরিকার মতো এই তরিকাটিও সুফী মতবাদগুলির মধ্যে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করে। সোহরাওয়ার্দীর যোগ্য শিষ্যরা দিল্লি, উত্তর ভারত ও পশ্চিম ভারতে এই মতবাদ প্রচার করেন।

৪. নকশবন্দী — তুর্কীস্থানের সুফী দরবেশ খাজা বাহাউদ্দীন মুহম্মদ নকশাবন্দ এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মতবাদ অনুসারে সম্পূর্ণ নীরব অবস্থায় জিকর করবার নিয়ম বর্তমান। বিভিন্ন দেশ তথা ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, তুরস্ক, চীনে এই তরিকার অনুসারী মানুষেরা অবস্থান করেন।

৫. মাদারী — 'সিরাত-ই-মাদারী' গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত সূত্র অনুযায়ী সুফী দরবেশ শাহ মাদার ভারতে প্রথম মাদারী তরিকার উদ্ভব ঘটিয়ে ছিলেন। এই তরিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, পীরের মাধ্যমকে অস্বীকার করে আল্লাহর সান্নিধ্য প্রত্যক্ষভাবে লাভ করা। ভারতের বিভিন্ন জায়গার মানুষ শাহী মাদারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

এছাড়াও আরও অনেক সুফী মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন রিফাইয়া তরিকা, সাঁতারী তরিকা, মৌলবিয়া তরিকা, জুনাইদি তরিকা, সদিলীয়া তরিকা, সানুসিয়া তরিকা, মুজাদ্দিদীয়া তরিকা প্রভৃতি। এদের মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন তরিকা, আবার অনেকগুলি

খুবই নতুন। আবার কোনো কোনো তরিকা পুরোনোর সঙ্গে নতুন মতবাদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। শোনা যায় এরকম চারশ'রও বেশি প্রকারের সুফী মতবাদ বা তরিকা বর্তমান।

সুফীবাদের বিভিন্ন প্রকারের মতবাদ প্রচলিত থাকলেও সর্বধরনের মতবাদেরই মূল কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। আল্লাহর নিবিড় সান্নিধ্য লাভই সুফীবাদের মূল উদ্দেশ্য। পার্থিব লোভ-লালসা থেকে নিজেকে মুক্ত করে পরম প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার চরম সুখই এদের মূল আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। এভাবেই আল্লাহর নিকট পৌঁছনোর মতে তারা বিশ্বাসী। তাঁদের মূলনীতির কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল।[১৪]

১) তওবা বা অনুতাপ — তওবা হল পাপ কাজ করবার জন্য অনুশোচনা। জাগতিক বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহকে পাবার সাধনাই তওবা। পাপ করবার ফলে যে দুশ্চিন্তা হয় তা আল্লাহ থেকে সাধককে ক্ষণকালের জন্য সরিয়ে রাখে। কিছুতেই তা যেন না হয়; অনুশোচনাই ব্যক্তিকে পাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকে, তওবা সেই বোধই মানুষের মনে জাগিয়ে রাখে।

২) তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা — আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভরতা স্থাপনের মাধ্যমেই তার পরম সান্নিধ্যলাভ সম্ভব। তাওয়াক্কুল সেই মতই সমর্থন করে।

৩) পরিবর্জন — জাগতিক সুখকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেই একমাত্র আল্লাহর কাছে উপনীত হওয়া যায় — সুফীরা এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন। পার্থিব ভোগ-লালসা, ইন্দ্রিয়গত চাহিদাকে পরিবর্জন করে আত্মার পরিশুদ্ধকরণে তারা জীবন উৎসর্গ করতেন।

৪) ধৈর্য বা সবর — জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে প্রতিমুহূর্তে ধৈর্য ধরতে হয়। অধৈর্য হলেই সমূহ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। সুফীসাধকরা এই ধারণা পোষণ করতেন। দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও প্রাত্যহিক জীবনে সর্বদা সবর বা ধৈর্য ধরেই কাজ করে যেতে হবে। সুফীরা সাধনার পথে এই পন্থাকেই সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করতেন। সাধনার পার্থক্যের উপর সবর বা ধৈর্যের তারতম্যর কথা তাঁরা স্বীকার করতেন।

৫) আত্মসমর্পণ — আধ্যাত্মিক পথে অবিচলিত থাকতে সুফীসাধকদের গুরু বা মুরশিদের কাছে দ্বিধাহীনভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়। মুরশিদের প্রতি মুরিদের পরম শ্রদ্ধা ও বিনয় থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। মারেফাত লাভ করার জন্য নিজেকে গুরুর নিকট সম্পূর্ণরূপে বিলীন করার কথাই বলে সুফী সাধনা। আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণেই আল্লাহকে বা পরম ইষ্টকে লাভ করা সম্ভব।

৬) পবিত্রতা বা এখলাস — পবিত্র হৃদয়েই জীবনের পরম সত্যকে লাভ করা যায়। আল্লাকে লাভ করতে গেলে পবিত্র চিত্তে তার ধ্যান করার কথা সুফী সাধকেরা বলে থাকেন। জাগতিক ভোগ-লালসা থেকে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত করে পবিত্র হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি আত্ম-উৎসর্গকেই তারা জীবনের মূল লক্ষ্য বলে মনে করেন।

৭) আল্লাহ-প্রেম বা ইশকে আল্লাহ — আল্লাহর প্রতি নিমগ্ন প্রেমই সুফীবাদের মূল বৈশিষ্ট্য। সুফী সাধকদের মত অনুযায়ী জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক প্রেমের সম্পর্ক। একাগ্র নিবিড় চিত্তে প্রেমধর্ম অবলম্বন করেই আল্লাহর সাধনা করতে হয়।

৮) জিকর বা স্মরণ — নিবিষ্ট হয়ে আল্লাহ বা পরমাত্মার নাম বারবার উচ্চারণ করা এবং স্বপনে, জাগরণে তার নাম স্মরণ করাকেই জিকর বলা হয়। সরবে বা নীরবে উভয়প্রকারেই জিকর করা যায়।

৯) সামা(সঙ্গীত) — এক ধরণের আধ্যাত্মিক উপাসনা সঙ্গীত হল সামা। অনেক সুফী সাধকরাই সঙ্গীত সাধনার মধ্য দিয়ে আল্লাহর আরাধনা করে থাকেন। চিশতীয়া সুফীসাধকেরা এধরণের সঙ্গীত সাধনার পক্ষপাতী।

১০) কৃতজ্ঞতা বা শুকর — বাস্তব জীবনের কঠিনতম পরিস্থিতিতেও আল্লাহর প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থা না হারিয়ে চিরকৃতজ্ঞ থাকতে হবে। আল্লাহর করুণায়ই মানুষের জীবনের সকল চাহিদা পূর্ণ হয়। তাই কোনো অবস্থাতেই তাঁর থেকে মুখ ফেরানো চলবে না। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা সুফীধর্মের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম।

১১) উদারতাবাদ — সুফীধর্ম একভাবে প্রেমধর্মেরই নামান্তর। এই ধর্মে গোঁড়ামি নেই। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক প্রেমের। আল্লাহর প্রতি পরম প্রেমানুভূতিই সুফীসাধকদের কাছে একমাত্র সত্য। ধর্মকেন্দ্রিক নানা বিধিনিষেধের আড়ষ্টতা তাদের মধ্যে একেবারেই নেই।

১২) ফানা ও বাক্কা — সুফীসাধকদের সাধনার পর্যায়ক্রমের শেষ সর্বোচ্চ স্তর হল ফানা ও বাক্কা। তাদের সাধনার পরিপূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে ফানাফিল্লাহের দ্বারা বাক্কা বিল্লাহের স্তরে পৌঁছানোর মধ্য দিয়ে। ফানাহি অর্থাৎ আত্ম-তন্ময়তা। এই সময় সুফী সাধক নিজেকে বিস্মৃত

হয়ে ঐশী চেতনায় আত্মবিলুপ্ত হয়। এর ঠিক পরবর্তী সর্বশেষ স্তর বাক্কায় সাধক ঐশী চেতনায় উপনীত হয়ে সেখানেই বিরাজমান থাকে। বলা বাহুল্য সকল প্রকার সুফী সাধককেই আধ্যাত্মিক সাধনার মূল আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাক্কাবিল্লাহয় অবস্থান করা। আল্লাহকে পাবার জন্য তাদের যে কঠোর সাধনা তা এই চরম স্তরে এসেই পরিপূর্ণতা লাভ করে।

(প্রসঙ্গসূত্র — ড. রশীদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত)

সুফীধর্মের উৎপত্তি, প্রকারভেদ, মূলনীতিসমূহ নিয়ে আমরা এতক্ষণ বিস্তারিত আলোচনা করার প্রচেষ্টা করলাম। বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম অংশে ইসলামের শরীয়ত সম্পর্কেও কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এখন আমরা দেখব প্রাক্ ঔপনিবেশিক বাংলা কাব্যে এই শরীয়ত ও মরীফত দর্শন কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

আহমদ শরীফ রচিত 'বাঙলার সূফী সাহিত্য' গ্রন্থে তিনি কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ বিশেষভাবে করেছেন যেখানে সুফী মতবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। মীর সৈয়দ সুলতান রচিত জ্ঞানচৌতিশা, শেখ চান্দ রচিত তালিবনামা বা শাহদৌলাপীরনামা, অজ্ঞাতনামা কবি রচিত যোগ কলন্দর, হাজী মুহম্মদ রচিত সুরতনামা বা নুর জামাল, কাজী শেখ মনসুর বিরচিত সির্নামা, আলি রাজা রচিত আগম ও জ্ঞানসাগর, মীর মুহম্মদ শফী কৃত নুরনামা প্রভৃতি গ্রন্থে লেখক দেখিয়েছেন কিভাবে সুফীতত্ত্বভাবনা কাব্যগুলির অন্তর্কাঠামোয় পরতে পরতে বিস্তৃত হয়েছে। এই গ্রন্থের ভূমিকা অংশ থেকে জানতে পারা যায়,

''ইসলামের উদ্ভবের প্রায় ১৫০ বছর পরের থেকে সূফীমত ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত

হতে থাকে এবং সময়ের বিবর্তনে প্রচলিত বিভিন্ন শাখার সূফীমতগুলো ভিন্ন ধরনের, তাই সূফীমত হচ্ছে একটি মিশ্র দর্শন।"[১৫]

(পৃষ্ঠা - ২৩, আহমদ শরীফ, বাঙলার সূফী সাহিত্য, সময় প্রকাশন, ঢাকা)

সূফীরা ভারতে প্রবেশ করার পর এদেশের অধ্যাত্ম তত্ত্ব ও সাধনার দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিল। এখানকার অদ্বৈতবাদ ও যোগমার্গের প্রভাবও যে এদের উপর কিয়দংশে পড়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। আবার অন্যদিক থেকে আর একটি ব্যাপারেরও উল্লেখ করা যায় যে ব্রাহ্মণ্য - শৈব ও বৌদ্ধ সহজিয়া - এই দুই মতবাদের সমন্বয়ে গড়ে ওড়া নাথপন্থার সঙ্গেও কখনও কখনও মিশ্রণ ঘটে সুফী ভাবনার। বাংলাদেশে যে একসময় সহজিয়া বৌদ্ধ ও নাথদের প্রভাব ভালোরকমই ছিল তার প্রমাণ হিসেবে চর্যার পদসমূহ ও গোরক্ষপন্থীদের রচিত নাথ সাহিত্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।[১৬]

তাই ভারতে প্রচলিত সুফীমতের উপর অন্যান্য বিভিন্ন দর্শনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়লেও কোনও কোনও সাহিত্যিক নিদর্শনে সুফী দর্শনের একক প্রভাবও লক্ষ করা যায়।

আনুমানিক ১৫৬৫ থেকে ১৬৩০ সালের কবি হাজী মুহম্মদ বিরচিত সুরতনামা বা নুর জামাল কাব্যের একটি অংশে চার মঞ্জিল — শরীয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারফত এর পরিচয় পাওয়া যায়। শরীয়ত অংশে কবি উল্লেখ করেছেন,

''শরীয়ৎ মঞ্জিলেত দৃঢ় হৈল যবে

তরিকত পন্থে পাও বাঢ়াইবা তবে।

বিনি শরীয়তে যদি তরিকতে চলে

না চিনিয়া পন্থ যেন তোকাএ আন্ধলে।

শরীয়ৎ সরসোস (ষড়রস?) মুস্তফা কহিছে

সকল মঞ্জিল শরীয়ৎ ঢাকি আছে।

শরীয়ৎ আগে দৃঢ় কৈলা পয়গাম্বর

সকল মঞ্জিল আছে শরীয়ৎ ভিতর।''[১৭]

(পৃষ্ঠা - ১৩৪, প্রাগুক্ত)

এই কাব্যেরই পরবর্তী অধ্যায় তরিকত এ দেখতে পাওয়া যায়,

''শরীয়ৎ মঞ্জিলের কহিল বাখান

অখনে শুনহ তরিকতের বয়ান।

তরিকত মঞ্জিলের শুন কহি কথা

যেন মতে পীর সবে দিছেন ব্যবস্থা।

তরিকত মঞ্জিলের মোকাম মলকুত

সে নুরের দীপ্ত তথা উদতা বহুত।''[১৮]

(পৃষ্ঠা - ১৩৫, প্রাগুক্ত)

এর ঠিক পরেই আসে হকিকতের প্রয়োজনীয়তা। এই স্তরে কঠিনতর সাধনা আবশ্যক হয়ে ওঠে। কাব্যের হকিকত অংশে দেখা যায়।

''হকিকত মঞ্জিলত আরোহা চিনিব

আপনা জানিয়া ফানি হকেতে মিশিব।

হকিকত মঞ্জিলে বুলি আতমা পরিচএ

আত্মা কি বস্তু তাকে কহিব নিশ্চএ।

আরোহারে আল্লা বুলি আমর খোদার

যে আমর হোন্তে পয়দা সকল সংসার।[১৯]

(পৃষ্ঠা - ১৩৫, প্রাগুক্ত)

উন্নততম সাধনার পথে আত্মনিয়োগ করে অভীষ্ট মঞ্জিলে উপনীত হবার সর্বশেষ স্তর হল মরীফত। মহত্তর পথে যাবার রাস্তায় এই স্তর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। কাব্যে মারফত অংশে দেখতে পাওয়া যায়,

''লাহুত মোকাম মারফতের মঞ্জিল

সাহেব দিদার যদি তথা আবরিল।

লাহুত মোকাম কিছু পাইবেক যবে

বাক্যসিদ্ধি কেরামত হএ তার তবে।

এক আল্লা আছিলেক না আছিল আর

একসর আছিলেক গোপত ভাণ্ডার।

যদি বা সংসার সুখ পাএত প্রচুর

ঠেলা দিয়া দুই পাত্র ফেলাইব দূর।

নহে যদি ভুলাইব কেরামত পাইয়া

না পায় দিদার তবে লাহুতেত গিয়া।

বিস্তর ফকির সবে জবরুতে গিয়া

ফিরিয়া বসিছে সব কেরামত পাইয়া।"[২০]

(পৃষ্ঠা - ১৩৬, প্রাগুক্ত)

সাংসারিক সুখ-দুঃখ, ভোগ-লালসা থেকে নিজেকে মুক্ত করে আল্লাহর প্রেমে আত্মবিলীন হওয়ার কথাই বলে সুফীধর্ম। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনেই পরমাত্মা অর্থাৎ আল্লাহকে পাওয়া সম্ভব। সংসার সুখের মোহে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখলে একেবারেই চলবে না। সুফী দর্শনের এই মূল তত্ত্বকথারই সাহিত্যিক প্রকাশ ঘটেছে কবি হাজী মুহম্মদ এর সুরতনামায়।

এই প্রকার প্রাক্ ঔপনিবেশিক বাংলা অনেক কাব্যেই সুফী তত্ত্ব ও দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। আমাদের পরবর্তী অধ্যায়গুলির মূল উপজীব্য পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মুসলিম কবির কাব্যে নারী। এই চার দশকের মুসলিম কবিদের লেখা রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যানগুলিকে নিয়েই মূলত আলোচনা করা হবে। এখন অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে এই

কাব্যগুলিতে শরীয়ত ও সূফী দর্শনের প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনার প্রচেষ্টা করা হবে।

পঞ্চদশ শতকে রচিত শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য দিয়ে এই আলোচনার সূত্রপাত করা আবশ্যক।

প্রথমেই একথা বলে রাখা প্রয়োজন যে ইরানের প্রণয় উপাখ্যানগুলিতে সুফীতত্ত্বের যথেষ্ট আভাস পরিলক্ষিত হয়। ফারসীতে রচিত 'ইউসুফ-জোলেখা'ও জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপক কাব্য।

কোর-আনের ১২ সংখ্যক সুরায় ইউসুফের কাহিনী বিবৃত রয়েছে।[২১] অন্যদিকে ফেরদৌসী বর্ণিত ইউসুফ-জুলেখা কিসসায় ইউসুফ-জোলেখার প্রেমকাহিনী সুফী তত্ত্ব ভাবনা জাত জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপকেই নির্মিত হয়েছে। আবুল কাসেম ফিরদৌসীর (৯৩৭-১০২০ খ্রীস্টাব্দ) ইউসুফ জোলেখার কাব্যকাহিনীতে আবদুর রহমান জামীর (১৪১৪-৯২ খ্রীস্টাব্দ) অনেকাংশ সংযোজন করে রচনা করেন তাঁর 'ইউসুফ জোলেখা কাব্য (১৪৮৩ খ্রীস্টাব্দে রচিত)।[২২] আমাদের আলোচ্য কবি শাহ মুহম্মদ সগীর (১৩৮৯-১৪১০ খ্রীস্টাব্দ) আবার এই দুই কাব্যের কাহিনীর অনেক কিছু সংযোজন করে রচনা করেন তাঁর কাব্য।

শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর কাব্যের নায়িকাকে তৈমুস রাজার কন্যা হিসেবে দেখিয়েছেন। এছাড়াও ইউসুফের দিগ্বিজয় সগীরের কাব্যেরই সংযোজন। স্বপ্নে নবীপুত্রকে দেখে বিধুপ্রভা আসক্ত হয়েছে জেনে ইউসুফ তাঁর ভাই ইবন আমীনকেই নবীপুত্র মনে করে দুজনের মিলন ঘটানোর প্রয়াস করেন। এই রূপকথাও শাহ মহম্মদ সগীর তাঁর কাব্য কাঠামোর প্রয়োজনে

সংযোজন করেন।

বাঙালী কবি সগীর ইউসুফ জোলেখার আধ্যাত্মিক প্রেমকাহিনীকে লৌকিক পর্যায়ে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা করলেও সুফীধর্মের উপাদান তাঁর কাব্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।

শরীয়ত মতানুসারে আল্লার সঙ্গে জীবের সম্পর্ক দ্বৈত। আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন জীব। সকল জীবই মৃত্যুর পর আল্লাহর নিকট পৌঁছে যায়। অন্যদিকে সুফীমতে আল্লাহ জীবের অদ্বৈত সম্পর্ক। মৃত্যুর পর জীবাত্মা, পরমাত্মার মিলন ঘটে। আশিক-মাশুকের সম্পর্কের মতোই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক। শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যের ১১৬ নং পৃষ্ঠায় কবিকে বলতে শোনা যায়,

''প্রেমরসে ধর্মবানী কহিমু ভরিয়া।।
ভাবক ভাবিনী হৈল ইছুফ জলিখা।
ধর্মভাবে করে প্রেম কিতাবেত লেখা।।''[২৩]

(পৃষ্ঠা - ১১৬, শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ জোলেখা,
ডক্টর এনামূল হক সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯)

তখন বোধগম্য হয় যে ইউসুফ ও জোলেখা প্রকৃত অর্থেই পরমাত্মা ও জীবাত্মার দ্যোতক হয়ে উঠেছে। কবি সগীর কাব্যমধ্যে অনেক স্থানেই ইউসুফকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করেছেন। এ থেকেও বোঝা যায় যে 'প্রভু' অর্থাৎ স্রষ্টারূপী আল্লাহ বলতে পরমাত্মা ইউসুফকেই বোঝানো হয়েছে। এভাবে কাব্যে সুফীতত্ত্বের নিগূঢ় অভিজ্ঞান নিহিত হয়ে আছে।

ষোড়শ শতকে রচিত দৌলত উজির বাহরাম খানের লেখা 'লায়লী মজনু' কাব্যের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। লায়লী-মজনুর প্রণয় গাথাও ইরানে উদ্ভূত। সুফী কবিরাই এই প্রণয়কথার উপর ভিত্তি করে কাব্য রচনা করেছিলেন। এই কাব্যও অধ্যাত্মতত্ত্বের রূপক হিসেবে রচিত। সৃষ্টি আশকের ও স্রষ্টা মাশুকের পবিত্র ইশকের কিসসাই হল 'লায়লী মজনু' কাব্যের অন্তর্কাঠামো।

বাংলা ভাষায় রচিত মৌলিক উপাখ্যান তখন বিরল ছিল। ফারসী ও হিন্দুস্তানী কাব্যগুলিকেই বাঙালী কবিরা অনুবাদ করতেন। তাঁরা নিজেদের রচনার বৈশিষ্ট্যে কাব্যগুলিকে প্রায় মৌলিক কাব্যেই পরিণত করেছিলেন। তত্ত্বভাবনা অন্তর্বুনটে থাকলেও কাব্যগুলি নর-নারীর লৌকিক প্রণয়গাথায় পর্যবসিত হয়েছিল। ইউসুফ-জোলেখা; লায়লী মজনু, সয়ফুলমুলুক - বদিউজ্জামাল, গুলে বকাওলি প্রভৃতি বিভিন্ন কাব্যের অনুবাদ-কর্ম থেকেই এ ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। সুফীতত্ত্বভাবনার ভিত্তি থাকলেও কবিদের অনুবাদ বৈদগ্ধ্যে তা হয়ে ওঠে নরনারীর চিরন্তন প্রেম আখ্যান কাব্য।

শুধু তাই নয়, ইরানী সুফী সাধনায় অনেক সময় যোগের প্রভাব লক্ষ করা যায়। ভারত - পাকিস্তানের যোগ-সাধনার সংস্পর্শে আসার ফলেই সুফীদের চিন্তা - চেতনায় যোগের প্রভাব পড়ে। শেখ শরফুদ্দীন বু আলি কলন্দর শাহ (মৃত্যু ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দ) সুফী দর্শন ও ভারতীয় যোগ শাস্ত্রের সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তাঁর সাধন পদ্ধতিকে 'যোগ কলন্দর' বলা হয়।[২৪]

(প্রসঙ্গসূত্র-বাঙলার সূফী সাহিত্য - আহমদ শরীফ, সময় প্রকাশন, পৃষ্ঠা - ১১৯)

যোগ আমাদের দেশের প্রাচীন অধ্যাত্মদর্শন। যোগ ও সাংখ্য - এই দুই প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন। প্রথমটি হল সাধনার পদ্ধতি এবং দ্বিতীয়টি সেই সাধনার দর্শন। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে ইরানী ও মধ্য এশিয়ার সুফীদের উপর ইহুদী, বৌদ্ধ, ঔপনিষদিক অদ্বৈতবাদের যথেষ্ট প্রভাব এসে পড়েছিল। যোগের দেহ-সাধনা, বৌদ্ধদের গুরুবাদ, ঔপনিষদিকদের অদ্বৈত-চেতনা - এসব কিছুর মেলবন্ধন ঘটেছিল সুফী মতাবলম্বীদের মতাদর্শে। তাই সুফী ধ্যান-ধারণাজাত কাব্যগুলিতেও সুফী দর্শনের পরস্পর - সমন্বয়ী ভিন্ন ধারণার আভাস পরিলক্ষিত হয়।

দৌলত উজির বাহরাম খাঁ বিরচিত 'লায়লী মজনু' কাব্যের সূচনায় 'হাম্‌দ' অংশে নিরাকার আল্লাহর শরীয়তী ইসলামি ধারণা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

''স্তুতি আদ্যে করিএ নৈরূপ নৈরাকার।

দোসর বর্জিত প্রভু মনে জানি সার।।

স্বরূপ অরূপ প্রভু অনন্ত সুরতী।

নিশ্চএ নিরেখ রেখ অনেক বিভূতি।।

করিম করুণা-সিন্ধু রহিম দয়াল।

রজ্জাক আহার দাতা পালএ সয়াল।।

আউয়ালে তাহান নাম পুরুষ পুরাণ।

আখেরে তাহার নাম রহিম নিধান।।"[২৫]

(পৃষ্ঠা-৭৯, দৌলত উজির বাহরাম খাঁ বিরচিত লায়লী মজনু,

আহমদ শরীফ সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬)

এর ঠিক পরবর্তী অধ্যায় 'না'ত' অংশে আবার সুফীদর্শনের প্রেমময় সৃষ্টিতত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে।

''আকাশ পাতাল মর্ত্য এ তিন ভুবন।

যার প্রেম রস হন্তে হইছে সৃজন।"[২৬]

(পৃষ্ঠা-৮১, প্রাগুক্ত)

এছাড়াও কাব্যে রাজ-প্রশস্তির পরেই 'পীর-স্তুতি'কে স্থান দেওয়া হয়েছে যা সুফীধর্মেরই অনুশীলন সম্পাদন।

সুফী দর্শনে যোগের প্রভাব সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে। একাব্যেও এর প্রমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। 'যোগীর নিকট মজনুর সঙ্কল্প জ্ঞাপন' অংশে দেখতে পাওয়া যায় —

''তুন্মি দেব ধর্মশীল গুণনিধি গুরু।

সর্ব দুঃখ নিবারণ যেন কল্পতরু।।

তুমি সিদ্ধ কলেবর জ্ঞানের মহিমা।"[২৭]

(পৃষ্ঠা - ১৩৪, প্রাগুক্ত)

এমনকি কাব্যে মজনুকেও যোগ-সাধনায় নিবিষ্ট হতে দেখা যায়।

এভাবে লায়লী মজনুর ন্যায় ষোড়শ শতকের অন্যান্য রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যানেও সুফী ধর্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়।

এই একই চিন্তা ও চেতনার সূত্র সপ্তদশ শতকে রচিত কাব্যগুলির মধ্যেও নিহিত হয়ে আছে। এই শতকের আলোচনার প্রারম্ভেই জানিয়ে রাখা আবশ্যক যে সপ্তদশ শতকের অন্যতম প্রধান দুই কবি দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল উভয়েই ছিলেন সুফী ধর্মে বিশ্বাসী। দৌলত কাজী চিশতী সম্প্রদায়ের এবং সৈয়দ আলাওল কাদেরী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

সতীময়না কাব্যের সম্পাদক ড: সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল এই কাব্যের কাহিনীর মধ্যে সুফীধর্মের প্রভাব লক্ষ করেছেন। তাঁর মতে ''ধর্মীয় চিন্তাধারার কারণেই সতীময়না ও পদ্মাবতী কাব্যের কাহিনী কাঠামোর মধ্যে সাদৃশ্য দেখা দিয়েছে।''[২৮] গোহারিরাজ মোহরা জামাতা লোরের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করার পর কাব্যে উল্লিখিত হয় —

''দারুণ পৃথিবী এই ব্যবস্থা তাহার।
এক যায় আন আইসে কেহ নহে সার।।
এসব জানিয়া মতিমন্ত বধু জন।
দান ধর্মে যায় চারি দিবস জীবন।।''[২৯]

(প্রসঙ্গ সূত্র - দৌলত কাজি, লোর চন্দ্রাণী ও সতীময়না, সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা-১০১)

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এই নশ্বরতা সম্পূর্ণভাবেই সুফী ভাবনা সঞ্জাত। লোরচন্দ্রাণী কাব্যে গুরুবাদের উপস্থিতিও লক্ষণীয়। এখানে দেখতে পাওয়া যায়, —

''পীর গুরু অভ্যাগত পূজেন্ত তৎপর।

লোক উপকার করে নাহি আত্মপর।।''[৩০]

(পৃষ্ঠা ৬, প্রাগুক্ত)

সাধনার উচ্চস্তরে উপনীত হবার জন্য সুফীবাদে গুরু বা মুর্শিদ থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় — কাব্যের এই দৃষ্টান্ত যেন সেই চিহ্নই বহন করে চলে।

এছাড়াও দৌলত কাজী ও আলাওলের কাব্যের বন্দনা অংশেও তাঁদের সুফী ধর্মের প্রতি তীব্র অনুরাগ সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়।

'পদ্মাবতী' কাব্যেও আলাওল জায়সীর অনুসরণে সুফী ধর্ম বিশ্বাসকে কাব্যে স্থান দিয়েছেন। কাব্যকাহিনীর মাঝে মাঝে সুফীধর্মের রহস্যবাদ বা mysticism-র উপস্থিতি লক্ষ করার মতো। 'প্রেম রূপ রূপ প্রেম বিরহের মূল' কাব্যের এই পংক্তিটিতে সুফী প্রেমতত্ত্বেরই আভাস পাওয়া যায়। এছাড়াও যোগীখণ্ডের মধ্যে দিয়ে যোগ দর্শন সাধনার পরিচয় এ কাব্যে বর্তমান।

অষ্টাদশ শতকেও অনেক মুসলিম কবির লেখা বৈষ্ণব পদের সন্ধান পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যও এক অর্থে মরমিয়া প্রেমসাধনারই অভিব্যক্তি যা সাহিত্যবিচারে সুফী ধর্মভাবনার প্রেম-বিরহ-মোক্ষ-এই ত্রিস্তর সাধনারই সমলক্ষণাক্রান্ত।

ধর্মভাব বিবর্জিত হয়ে যেমন সাহিত্য রচনা সম্ভবপর হয় না, তেমনি একইভাবে সমাজের ভিন্নমাত্রিক প্রেক্ষিত স্বাভাবিক নিয়মেই এসে পড়ে সাহিত্যে। এমনই এক অনস্বীকার্য প্রেক্ষিত হল সামাজিক লিঙ্গের প্রেক্ষিত। আমাদের পরবর্তী অধ্যায়সমূহ আবর্তিত হবে মধ্যযুগের বিশেষ করে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মুসলিম কবিদের কাব্যে নারীদের অবস্থানকে কেন্দ্র করে। তা বোঝার ক্ষেত্রে কবিদের আধ্যাত্মিক দর্শন ও ধর্মীয় চিন্তাধারাকে পর্যালোচনা করা খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

তথ্যপঞ্জী

১. H. Elliot and T. Dowson, The History of India as told by its own historians, (London : 1867-77, 8 Vols) Vol. III, Page 4-6

২. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ইসলাম ধর্মের রূপরেখা, অনুবাদ মলয় চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ ২০০৯), পৃষ্ঠা ১১

৩. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩

৪. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭

৫. পবিত্র কুরআন, বাংলা অনুবাদ (কলকাতা : বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, মে ২০১২) পৃষ্ঠা ১৪৫ সূরা : ৬, রুকু-৪, ৪০ সংখ্যক এর অর্থ - ''আল্লাহর পথ প্রদর্শনের অর্থ - এক সত্য সন্ধানীকে জ্ঞানলাভের উপায়-উপকরণ থেকে উপকার লাভের সুযোগ দান করা হয় এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে সে সত্য পর্যন্ত পৌঁছবার পন্থাসমূহ লাভ করতে থাকে।''

৬. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭

৭. পবিত্র কুরআন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫

৮. পবিত্র কুরআন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৫

৯. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, ইসলামের হকীকত (কোলকাতা : বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাষ্ট, অক্টোবর ২০১২) পৃষ্ঠা ৫১

১০. ড. রশীদুল আলম, সূফী সাধনার ভূমিকা (ঢাকা : আয়েশা কিতাব ঘর, ২০০২) পৃষ্ঠা ১৪

১১. ড. রশীদুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫০-৫৩

১২. ড. রশীদুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫, ৩৬

১৩. মাহমুদা খানম, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সুফী কাব্যের প্রভাব (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুন ২০০৩) পৃষ্ঠা ৩৮-৪২

১৪. ড. রশীদুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭-৪২

ড. রশীদুল আলম সুফীধর্মের মূল নীতি সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে বিশদে আলোচনা করেছেন। তার মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলি আলোচনা করা হল।

১৫. আহমদ শরীফ, বাঙলার সূফী সাহিত্য, (ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০১১), পৃষ্ঠা ২৩

১৬. আহমদ শরীফ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫

১৭. আহমদ শরীফ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৪

১৮. আহমদ শরীফ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৫

১৯. আহমদ শরীফ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৫

২০. আহমদ শরীফ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৬

২১. পবিত্র কুরআন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৭ - কুরআনের রুকূ ১২, সূরা ইউসুফ-এ ইউসুফের কাহিনি বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

২২. শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ জোলেখা, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯), পৃষ্ঠা ৬৭

২৩. ইউসুফ জোলেখা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৬

২৪. আহমদ শরীফ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৯

বাংলায় মুসলিম বৈরাগীদের ‘কলন্দর’ বলে অভিহিত করা হত।

২৫. দৌলত উজির বাহ্‌রাম খাঁ বিরচিত লায়লী মজনু, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, নভেম্বর ২০০৬), পৃষ্ঠা ৭৯

২৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮১

২৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৪

২৮. দৌলত কাজি, লোর চন্দ্রাণী ও সতী ময়না, সম্পাদনা দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ২০০৬) ভূমিকা, পৃষ্ঠা আঠাশ

২৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০১

৩০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬

তৃতীয় অধ্যায়

পঞ্চদশ শতকের মুসলিম কবির কাব্যে নারী

কবির ভাষায়, ''সৃষ্টির সহিত সাহিত্যের তুলনা হয়। এই অসীম সৃষ্টিকার্য অসীম অবসরের মধ্যে নিমগ্ন। ... সাহিত্যও সেইরূপ অবসরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে।''[১] সৃষ্টিরহস্যে নারী ও পুরুষ বিভেদ যেমন বর্তমান, সাহিত্যেও তার প্রকাশ অস্বাভাবিক নয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারা এই সাক্ষ্য বহন করে। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যও এর ব্যতিক্রম নয়। আজকের তারিখের সামাজিক কিম্বা সাংস্কৃতিক লিঙ্গ বৈষম্য মধ্যযুগীয় কাব্যে কীভাবে উপস্থিত ছিল তা অনুধাবনযোগ্য। বলা বাহুল্য সে যুগের কাব্যের এক ধারা ধর্মের এবং অন্য ধারা রসের দিকে ধাবমান। লৌকিক জীবনের সান্নিধ্য থাকলেও হিন্দু কবিদের কাব্যে মূলত দেবদেবীর মাহাত্ম্যমূলক কাহিনি গুরুত্ব পেয়েছে। মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য প্রভৃতি কাব্যসমূহের মূল অভিপ্রেত পূজা প্রচার বৃদ্ধি। অন্যদিকে মুসলিম কবিদের কাব্যে ধর্ম প্রচ্ছন্নভাবে থাকলেও কোথাও দেবত্ব আরোপিত হয়নি। রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যানগুলিতে আপাত ধর্ম নিরপেক্ষ কাহিনি মানব-মানবীর প্রেমধর্মের বয়ান নির্মাণে প্রচেষ্ট হয়েছে। বিরহ-মিলন পূর্ণ প্রেমকাহিনিগুলির অন্তর্কাঠামোয় নারী পুরুষের ভিন্নতর ভূমিকা উদ্‌ঘাটন তাই অনেক ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। কালানুক্রমিকভাবে একই সময়ে রচিত মুসলিম কবির কাব্যগুলি কেন ভিন্ন স্বাদের হয়ে উঠেছে, স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন উঠে আসে। আর এর উত্তর অন্বেষণের জন্য সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বুঝে নেওয়া প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় তুর্কী আক্রমণের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুমাত্রায় পরিবর্তন সাধিত হয়। শাসনকাঠামোয় সামন্ততান্ত্রিকতার ও সামন্তপতির বিধিই সাধারণ মানুষের প্রতি কার্যকরী হয়। শাসকশ্রেণীর স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ নিয়োজিত হয়। এধরনের রাজার কাছে নারীও গণ্য হয় পণ্যস্বরূপ। আমাদের আলোচিত মুসলিম কবিরা এই শ্রেণীর সামন্তপ্রভুর রাজসভায় পৃষ্ঠপোষকরূপে অনেক সময় অবস্থান করেন। রাজার মনোরঞ্জনের জন্য রচনা করেন রোমান্টিক উপাখ্যান। কোনো কোনো কাব্যে ধর্মতত্ত্বকথা থাকলেও তা আছে রূপকের আশ্রয়ে, কাব্যের মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে নরনারীর প্রেম আখ্যান।

তুর্কী বিজয়ের ফলস্বরূপ এদেশে ইসলাম ধর্মের আধিপত্য বিস্তারিত হয়। ইসলামের মরমীয়াবাদী সুফীরা আবার আল্লাহর সাথে মানুষের প্রেমের সম্পর্ককে আশেক - মাশুক তত্ত্বের দ্বারা প্রকাশ করেন। আধ্যাত্মিক মার্গের এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে রোমান্সধর্মী কাব্য রচনা করেন ইরান ও ভারতের সুফী কবিরা। তাঁদের অনুসরণেই বাংলার মুসলমান কবিগণ প্রণয় উপাখ্যান রচনায় ব্রতী হন। অর্থাৎ, বোঝাই যাচ্ছে সমকালে রচিত হলেও হিন্দু কবিগণের দ্বারা রচিত কাব্যের থেকে মুসলিম কবিদের কাব্যের ধারা পৃথক হবার পেছনে কীভাবে কাজ করছে ভিন্নমাত্রিক সামাজিক পশ্চাদপট।

এই রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান কাব্যধারার প্রবর্তক হলেন পঞ্চদশ শতকের শাহ মুহম্মদ সগীর। তাঁর রচিত 'ইউসুফ জোলেখা' এই ধারার প্রথম কাব্য। যদিও আদি ও মধ্যযুগের

অন্যান্য অনেক কবির মতো সগীরের কাল নিয়েও অনেক বিতর্ক বিদ্যমান। কাব্যমধ্যে নিজের কাল ও পরিচয় নিয়ে হেঁয়ালির সূত্র ধরেই এই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের ভূমিকায় শাহ মুহম্মদ সগীর গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের (১৩৯৭-১৪১০ খ্রীঃ) উল্লেখ করেছেন।[২] বিদ্যোৎসাহী হিসেবে এই সম্রাটের খ্যাতি ছিল। মধ্যযুগের বহু কবিই তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন। তবে মধ্যযুগে একাধিক গিয়াসুদ্দিনকে পাওয়া যায় যার মধ্যে গিয়াসুদ্দিন আযম শাহই ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। তার প্রশংসাই 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যে পাওয়া যায়,

''তিরতিএ পরণাম করোঁ রাজ্যক ঈশ্বর।
বাঘে ছাগে পানি খাএ নিভয় নিডর।।
রাজ রাজেশ্বর মধ্যে ধার্মিক পণ্ডিত।
দেব অবতার নৃপ জগত বিদিত।।
মনুষ্যের মধ্যে জেহ্ন ধর্ম অবতার।
মহা নরপতি গ্যেছ পৃথিবীর সার।।'' [৩]

(পৃ-১১৫, শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত 'ইউসুফ জোলেখা',
ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা,
তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৯)

এই গুণগান গিয়াসুদ্দিন আযম শাহের প্রতি হওয়াই স্বাভাবিক কারণ তিনি ছিলেন যথার্থ গুণীর পৃষ্ঠপোষক। আর এই সূত্র ধরেই শাহ মুহম্মদ সগীরকে পঞ্চদশ শতকের কবি বলে অভিহিত

করা যায়।

'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য রচনার প্রেরণা শাহ মুহম্মদ সগীর মূলত পান আরবদেশের কাহিনি থেকে। ফেরদৌসী তূসী হলেন ফারসী সাহিত্যে এই কাব্যধারার আদি কবি। আহমদ শরীফ এর মতানুসারে, 'ফেরদৌসীর নামে চালু আদি ইউসুফ জোলেখা ছাড়া আবদুর রহমান জামীর (১৪১১-১৪৯২) ইউসুফ জোলেখাই (১৪৮৩ খ্রীঃ) মুসলিম জগতে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে, যদিও ফেরদৌসীর পূর্বেও অজ্ঞাতনামা দুই কবির অপ্রাপ্ত দুখানি ইউসুফ জোলেখা কিসসা-কাব্য ছিল বলে ইরানে জনশ্রুতি রয়েছে।' [৪]

(আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, পৃ-৫০৭)

আবার, কাব্যমধ্যে সগীর এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন,

''পুরাণ কোরান মধ্যে দেখিলুঁ বিশেষ।
ইছুফ জলিখা বাণী 'অমৃত' বিশেষ।।
কহিমু কিতাব চাহি সুধারস পুরি।
শুনহ ভকত জন শ্রুতি ঘট ভরি।।
দোষ খেম গুণ ধর রসিক সুজন।
মোহাম্মদ ছগির ভনে প্রেমক বচন।।''[৫]

(পৃ-১১৬, শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ জলিখা, ডক্টর মুহম্মদ এনামূল হক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৯)

অর্থাৎ, এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে কেবলমাত্র ফারসী কাব্যের অনুপ্রেরণাই নয়, কোরানের ভাষ্য থেকেও তিনি কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

এবার মূল কাব্যে অনুপ্রবেশ করে আমাদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে পঞ্চদশ শতকের শাহ মুহম্মদ সগীর কীভাবে তাঁর কাব্যে নারী চরিত্রের ক্রমবিকাশ ঘটিয়েছেন। এর আগে স্বল্প পরিসরে দেখে নেব পঞ্চদশ শতকের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে নারীর চরিত্রায়ণ কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলার আদি নিদর্শন চর্যাপদগুলিতেও নারী প্রসঙ্গ বারবার এসে পড়েছে। চর্যাগীতিতে সহজিয়া বৌদ্ধদের কায়াসাধনার অন্তরালে যে সমাজ জীবনের চিত্র উঠে আসে, তার মধ্য থেকে তৎকালীন নারীর অবস্থাও অনেকাংশে বোধগম্য হয়। চর্যায় শবর শবরীর ভোগোন্মত্ত জীবনের ছবি পাওয়া যায়। ২৮ সংখ্যক গানে দেখা যায় শবরী সুসজ্জিত হয়ে একা বনবিহারে বহির্গত হয়। 'একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডল ব্রজধারী।।"[৬] অর্থাৎ শবর-রমণীদের বাড়ীর বাইরে বেরোনোর স্বাধীনতা ছিল। এমনকি ডোমনারীদের দেখা যায় তারা বংশতন্ত্রী নির্মিত চাঙ্গারি বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করত। ১০ নং গানে ডোমনীর নৃত্য পরায়ণা রূপের চিত্রও অপরিচিত নয়। ''এক সো পদুমা চৌসঠী পাখুড়ী। তহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।।"[৭] সামাজিক শৃঙ্খলার শিথিলতাও কোথাও কোথাও ধরা পড়ে। ডোমনারী কুলীনের সেবা করতেন এবং কাপালিককেও প্রত্যাখান করতেন না। ডোম্বীর সঙ্গসুখ লাভের জন্য কপালী যোগীরা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতেন। ৪ নং গানে শাশুড়ীকে ঘরে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে নরনারীর মিলন ঘটতে দেখা যায়। এরকম অনেক ক্ষেত্রেই

নারীচরিত্রের স্খলন লক্ষ করা যায়। দিনের বেলায় যে নারী আপন ছায়া দেখে ভয় পেত, সেই নারীই রাতে শ্বশুর নিদ্রাভিভূত হলে স্বচ্ছন্দে বিহার করত। ''দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ। রাতি ভইলে কামরু জাঅ।''[৮] অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে কোনো এক সময় যদি চর্যার রচনাকাল হয়, তবে সেই সময়ের খণ্ডচিত্র পরবর্তী কালের সাহিত্য সৃষ্টিকে কতটা প্রভাবিত করেছে কিম্বা করেনি তা লক্ষ করার বিষয়। নারী স্বাধীনতা, নারী চরিত্রের বিবর্তনকে মূল্যায়ণ করার ক্ষেত্রে তাই পূর্ব ঐতিহ্যকে স্মরণ করতেই হয়।

এ প্রসঙ্গে ত্রয়োদশ শতকের বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা চরিত্রের ক্রমবিবর্তনকেও উল্লেখ না করে পারা যায় না। কৃষ্ণপ্রেরিত ফুল-তাম্বুল প্রত্যাখ্যান করে সে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা প্রকাশ না করেই।

''ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোয়াল তা সমে কি মোর নেহা।।''[৯]

(পৃ-১৯৫, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯)

মধ্যযুগের নারীর যে সামাজিক অবস্থান, সেই অবস্থান থেকেই সমাজ প্রতিনিধি হিসেবে রাধার কণ্ঠস্বর কাব্যে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়। দানখণ্ডে কৃষ্ণের সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত মিলনে রাধা বিপর্যস্ত এবং ভীত হয়েছেন।

''বুধি বোল এঁবে ঘর জায়িব কোন ছলে।''[১০]

(পৃ - ২৬১, প্রাগুক্ত)

এখানে যেন রাধার আর্তি শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে দ্বিতীয়বার মিলনের সময় 'রাধার মনত তবেঁ জাগিল মদন।'[১১] এভাবে কবি কৃষ্ণের তুলনায় রাধা চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে অনেক বেশি বাস্তবতার সঙ্গে নির্ভরযোগ্য করে তুলেছেন।

সগীরের কাব্যে নারী চরিত্রের বিকাশ কতটা নৈপুণ্যের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে তা অনুসন্ধানযোগ্য। কাব্যের প্রারম্ভে আল্লাহ ও রসূল বন্দনা, মাতাপিতা ও গুরুজন বন্দনা, রাজ প্রশস্তি, পুস্তক রচনার কথা ইত্যাদির পরেই এসে পড়ে জোলেখার রূপ বর্ণনা। কাব্যে নায়িকার গুণের থেকে রূপের কদর বেশি করা হয়, বাজার অর্থনীতির যুগের অনেক আগেও এই চিরাচরিত প্রথা প্রবর্তিত ছিল। এই প্রথাকেই অকপটে গ্রহণ করেছেন তিনি। জোলেখার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথকভাবে অলঙ্কারমণ্ডিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে কয়েকটি পংক্তির উল্লেখ করা হল,

''কুচযুগ মধুপূর্ণ কাঞ্চন কটোরা।
সুবলিত সুধাতনু মণি ফল জোড়া।।
সুবর্ণ ডালেত দুই দাড়িম্ব রতন।
নীলমণি উদিত অন্তরগত ধন।।''[১২]

(পৃ-১১৯, ইউসুফ জোলেখা কাব্য, প্রাগুক্ত)

এর পাশাপাশি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের কৃষ্ণকে বড়াই রাধার যে রূপবর্ণনা করেছে তাম্বুল খণ্ডে তা হল,

''কুচযুগ দেখি তার আতি মনোহরে।

আভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে।।

মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।

মত্ত রাজহংস জিণী চলএ বিলম্বে।।''[১৩]

(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : পৃ -১৯১)

এই দুই রূপবর্ণনার মধ্যে যেন কোনো অন্তর্মিল ধরা পড়ে। মধ্যযুগের প্রায় সমস্ত কাব্যমধ্যেই নায়িকার রূপ বিষয়ক সুদীর্ঘ বর্ণনার চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। শাহ মুহম্মদ সগীর ফারসী কবি ফেরদৌসী তূসীর রোমান্টিক বর্ণনাকেও অনেকাংশে অবলম্বন করেছেন। জোলেখা কর্তৃক স্বপ্নাবির্ভূত মূর্তির অনুধ্যান অংশেও কোনো মহিলার স্বাধীন অভিব্যক্তি লক্ষ করবার মতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ অনুশাসনে নারীকে লজ্জায় অবগুণ্ঠিত থাকতে দেখা যায়। কিন্তু শাহ মুহম্মদ সগীরের রচনায় এক স্বউন্মোচিত নায়িকার স্বর শুনতে পাওয়া যায়। জোলেখার প্রথম স্বপ্ন থেকে জোলেখার প্রথম প্রেমানুরাগ এবং জোলেখার দ্বিতীয় স্বপ্ন থেকে জোলেখার প্রেমাভিব্যক্তি — প্রেমের পথে তার এই ক্রমিক উত্তরোত্তর উত্তম পর্যায়ে বিবর্তন, মধ্যযুগের সময়ানুপাতে এক বিরল দৃষ্টান্তের পরিচয় দেয়। পরবর্তী পর্যায়ে সে শুধুমাত্র প্রেমনিবেদনেই সপ্রতিভ নয়, তার কামাতুর অবস্থাকেও অনায়াসে প্রকাশ করে নির্দ্বিধায়।

''মুঞি নারী কাম-হতা বিধি মোরে দিল ব্যথা

কোন মতে নাহি প্রতিকার।''[১৪]

(পৃ-১২৯, ইউসুফ জোলেখা কাব্য)

কামহীন প্রেম-অনুভূতিতে আবদ্ধ রাখেননি কবি জোলেখাকে। বাস্তব শরীরী আবেদনকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেছেন সমকালের দাবী না মেনেই। কামরসে জারিত হয়ে বুদ্ধিলোপের কথাও উঠে এসেছে অসম্ভব আধুনিক মেজাজে।

''কাম রস মতি সতী হৈল শতগুণ।

বুদ্ধি শুদ্ধি হারাইল আর পাপপুণ্য।।''[১৫]

(পৃ-১৩০, ইউসুফ জোলেখা কাব্য)

জোলেখার ন্যায় প্রেমবিহ্বল অবস্থা আমরা কবি সগীরের অনেক পরবর্তী কালের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'বীরাঙ্গনা কাব্য' এর দ্বিতীয় সর্গ 'সোমের প্রতি তারা' তে তারার কণ্ঠস্বরে যেন প্রতিফলিত হতে দেখি —

''... কোন্ দোষে দোষী তব পদে

অভাগিনী? কুমুদিনী কোন্ তপোবলে

পায় তোমা নিত্য, কহ? আরম্ভি সত্বরে

সে তপঃ আহার নিদ্রা ত্যজি একাসনে।

কিন্তু যদি থাকে দয়া, এস শীঘ্র করি!

এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে

তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়া

সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা মণি!''[১৬]

(পৃষ্ঠা - ৬, ৭, মধুসূদন দত্ত, বীরাঙ্গনা কাব্য, ঊষা পাবলিশিং হাউস, কলকাতা)

কবি শাহ মুহম্মদ সগীর কাব্যের প্রথমাংশে বাস্তবের তুলনায় জোলেখার স্বপ্নকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। জোলেখার তিনটি স্বপ্নের বিবরণী দেখতে পাওয়া যায়। তার প্রেমাতুর অবস্থা পদাবলী সাহিত্যের রাধার কৃষ্ণের প্রতি পূর্বরাগের কথা মনে করিয়ে দেয়। এক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়।

''হৃদয় অন্তরে ব্যথা সঘন সঞ্চার।

কাম বাণে দহএ নয়নে বহে ধার।।

বহুল রুদিত আঁখি বিচলিত হিয়া।

মুশ্চিত পড়িল ভূমি আলিঙ্গন দিয়া।।''[১৭]

(পৃ-১৩৩, প্রাগুক্ত)

এই বর্ণনার সঙ্গে চণ্ডীদাসের রাধার অবস্থার তুলনা করা চলে,

''সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ - পানে

না চলে নয়ান - তারা।

বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে

যেমত যোগিনী পারা।।''[১৮]

(পৃষ্ঠা-২৯, বৈষ্ণব পদাবলী চয়ন, কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯)

আবার অন্যদিক থেকেও বৈষ্ণব সাহিত্যের রাধাকৃষ্ণের আদর্শ অনুসারে 'ইউসুফ জোলেখা'

কাব্যে পরকীয়া প্রেমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাধা ও জোলেখা দুজনেই বিবাহিতা নারী। কাব্যমধ্যে অন্য পুরুষের সঙ্গে তাদের প্রণয়গাথার বিবরণ পাওয়া যায়। আবার এই দুজনের স্বামীই নপুংসক। বলা ভালো, তাদের স্বামীদের নপুংসক করা ছাড়া কবিদের তাঁদের কাব্যের নায়িকাদের পরকীয়া প্রেমের সমর্থনে অন্য কোনো জোরালো যুক্তি ছিল না। জীবনসত্যের দাবিতে তাই কাব্যগুলি হয়ে উঠেছে মানবিক গুণ সমৃদ্ধের অধিকারী। অথচ লক্ষ করার মতো রাধা এবং জোলেখা — এই দুজনের স্বামীই কর্মবীর ও সামাজিক ক্ষমতার অধিকারী। অর্থাৎ, নারী চরিত্ররা বৈবাহিক সূত্রে সমাজে প্রতিপত্তি পেলেও যৌবন রসে বঞ্চিত হয়ে অন্য পুরুষে আসক্ত হয়েছে। রাধার ক্ষেত্রে কৃষ্ণের অপ্রতিরোধ্য প্রচেষ্টা তাদের মিলনে অনুঘটক হলেও জোলেখার ক্ষেত্রে বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র কাব্যে ইউসুফকে পাবার জন্য মরিয়া হয়ে যে নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করে। আর এখানেই সে হয়ে ওঠে মধ্যযুগের কাব্যধারায় বিরল দৃষ্টান্ত।

কোরআন-এর ১২ নং সুরায় ইউসুফ বৃত্তান্তে জোলেখার তিনটি স্বপ্নের বর্ণনা পাওয়া যায় না। আজিজ-পত্নী জোলেখার প্রেমিকা সত্তা এখানে অনুপস্থিত। জোলেখা ইউসুফকে সম্ভোগে আহ্বান করলে সে অসম্মত হয়। সেখান থেকে পালানোর জন্য প্রবৃত্ত হলে আজিজ পত্নী তার বস্ত্র আকর্ষণ করলে তা ছিঁড়ে যায় এবং সে মুহূর্তেই আজিজ সেই স্থানে উপস্থিত হয়। জলিখা ইউসুফের নামেই শ্লীলতাহানির নালিশ জানায়। বিচারে ইউসুফেরই জয় হয়।[১৯] এত কথা বলার একটাই উদ্দেশ্য যে শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যে জোলেখা চরিত্রের যে

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাই তা কিন্তু কোরআনের ভাষ্যে নেই। কোর-আনে বর্ণিত জোলেখা চরিত্র শুধুমাত্র একটি ঘটনার সাক্ষী হিসেবে রয়েছে, তার অতিরিক্ত কিছু দাবী করে না।

ফেরদৌসী তূসীর কাহিনিতে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে রাইয়ান-জোলেখার নাম পাওয়া যায়। ইউসুফ-জোলেখার বিবাহ ও মিলনে কাহিনিটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

আবদুর রহমান জামীর (১৪১৪-৯২ খ্রীঃ) 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যটি (১৪৮৩ খ্রীঃ রচিত) সগীরের কাব্যের অনেক পরে রচিত। এই কাব্যে জোলেখা ইউসুফকে দেখার আগেই স্বপ্নে তাকে তিনবার দেখেছিল। স্বপ্নে নির্দেশ পেয়েই আজিজের সঙ্গে বিবাহে আগ্রহ দেখায় জোলেখা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার সঙ্গে স্বপ্নে দেখা ব্যক্তির রূপগত সাদৃশ্য খুঁজে না পাওয়ায় ব্যর্থ মনোরথ হয় সে। এমনকি জামীর কাহিনিতে ইউসুফকে প্রলুব্ধ করার প্রয়োজনে জোলেখা যে বিবস্ত্রা, চুম্বনরতা নারীচিত্র সম্বলিত প্রমোদগৃহের আয়োজন করেছিল তার বর্ণনাও পাওয়া যায়।[২০] এর থেকে একটা বিষয়ই প্রমাণ হয় যে পরবর্তী কালের ঐতিহ্যও সাক্ষ্য দেয়, জোলেখা চরিত্রটি প্রকৃতিগত দিক দিয়েই ইউসুফ চরিত্রের থেকে অনেক বেশি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে।

ফেরদৌসী বর্ণিত কাহিনিতেও প্রত্যাখ্যাত প্রতিহিংসাপরায়ণ জোলেখার জীবন্ত চরিত্র লক্ষ করার মতো। নির্দোষ ইউসুফকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করে তবেই তার শান্তি মেলে।[২১] ইউসুফের সত্যনিষ্ঠা ও সংযম তাকে আদর্শ চরিত্র করে তুলতে পারে, কিন্তু জোলেখার প্রেমলিপ্সা, হিংসা তাকে অনেক বেশি রক্তমাংসের করে তুলেছে।

শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যে 'জোলেখার গান' অংশে দেখতে পাওয়া যায়,

''মুঞি কুলবতী সতী তোহ্মার চরণ গতি

করপুটে তোহ্মাত মিনতি।

তুহ্মি বিনে নাহি আর কত সৈমু দুক্ষভার

শুন মোর প্রাণপতি।

কামানলে দহিমু না কতি।।''[২২]

(পৃষ্ঠা-২০৪, প্রাগুক্ত)

নিজ পতি থাকা সত্ত্বেও পরপুরুষের প্রতি এ হেন আকুতি পাঠককে চমকিত করে। সপ্রতিভ জোলেখা সামাজিকতাকে তুচ্ছ করে নিজের হৃদয়ের আবেগকে প্রাধান্য দিয়েছে। ইউসুফের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমের পরাকাষ্ঠাকে যেন সমর্থনযোগ্য করে তোলা হয়েছে। সে প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হলে কী করবে তাও বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করেছে,

''জদি মোর মনুরথ ন পুরাহ তুহ্মি তত

শুন মোর প্রাণপতি।

আপনা বধিমু মুয়ি তত্ত্ব।।''[২৩]

(পৃষ্ঠা - ২০৫, প্রাগুক্ত)

নিজেকে শেষ করার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ইউসুফকে বধ করার অঙ্গীকারেও জোলেখা কুণ্ঠাবোধ করেনি,

''মোর দেখি মৃত অঙ্গ আজিজের মন ভঙ্গ

শুন মোর প্রাণপতি।

তোহ্মাক বধিব নিরাতঙ্ক।।''[২৪]

(পৃষ্ঠা - ২০৫, প্রাগুক্ত)

জোলেখার মনস্তত্ত্ব এখানে যেন আমাদের চারপাশের দেখা প্রেমে প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক হৃদয়ের সঙ্গে একীকৃত হয়ে যায়। কাব্যমধ্যে অনেক জায়গায় রাধা-কৃষ্ণের সঙ্গে যেন জোলেখা-ইউসুফকে মেলানো হয়েছে। কাব্যের একটি অধ্যায়ের নাম 'বৃন্দাবনে রূপসী পরিবৃত ইউসুফ ও জোলেখা'। বৃন্দাবন স্থানটি এখানে উল্লেখযোগ্য। ইউসুফকে প্রলুব্ধ করার উপায় ধাই জোলেখাকে দেয়,

''তোহ্মা জথ সখী আছে নৌআলি জৌবন।

তা সব পাঠাই দেঅ জাউক বৃন্দাবন।।

.....

কেহ নৃত্য করে রঙ্গে কেহ গীত গাএ।

কেহ কবিলাস বেণু রুদ্রাক্ষ বাজাএ।।''[২৫]

(পৃষ্ঠা-১৯২, প্রাগুক্ত)

এই বর্ণনার সঙ্গে কোথাও যেন শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার রাসলীলার অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়।

নারীর বুদ্ধি সম্পর্কে পুরুষের ব্যঙ্গসূচক উক্তিও কাব্যে কোথাও কোথাও শুনতে পাওয়া যায়,

''শুন কন্যা তোহ্মাক কহিএ কিছু শুদ্ধি।

রাজার কুমারী হৈয়া নহি জান বুদ্ধি।।''[২৬]

(পৃষ্ঠা - ১৯০, প্রাগুক্ত)

তবে একটু অভিনিবেশ করলেই দেখা যায় ইউসুফের এই ব্যঙ্গ জোলেখাকে সামাজিক বিধি নিয়ম বিষয়ে সতর্ক করার জন্য। আজিজের পত্নী হিসেবে পরিচিত জোলেখা যাতে তার কর্তব্য ধর্ম থেকে বিচ্যুত না হয় সে কারণে ইউসুফ তাকে বলে,

''শ্বেত বাস তোহ্মার নবীন অনুদিন।

বুন্দেক পড়িলে কালি সর্বত্রে মলিন।।

তিলেক এ সুখ হৈব জন্মান্তরে পাপ।''[২৭]

(পৃষ্ঠা - ১৯১, প্রাগুক্ত)

ইউসুফের কাছ থেকে এত কঠিন বাণী শোনার পরও জোলেখা পরাজয় স্বীকার করেনি। পরবর্তী প্রচেষ্টার স্তরে সম্মুখীন হয়েছে সন্তর্পণে। ধাই-এর কাছে জিজ্ঞেস করেছে সে,

'কি করিব কহ ধাঞি কি আছে, জুকতি।।

ধাঞি বোলে মোর ঠাঁই আছে এক বুদ্ধি।''[২৮]

(পৃষ্ঠা - ১৯১, প্রাগুক্ত)

নারীরা একত্রিত হয়ে বুদ্ধি বিনিময় করে সমস্যা সমাধানের যে চেষ্টা করছে, তা যেন আদিম গোষ্ঠী চেতনার 'সম্মিলিত শক্তি' বা 'Collective Strength' এর সাক্ষ্য বহন করে।

ইউসুফকে লাভ করার জন্য জোলেখা নারীসুলভ লজ্জা, নমনীয়তা এই সবকিছুকেই পরিহার করেছিল। নির্জন পুরীতে সে সরাসরি ইউসুফকে প্রস্তাব দেয়, 'পরিহরি লজ্জা ভীত কর উপভোগ।।'[২৯] জোলেখার মতো এহেন বলিষ্ঠ প্রস্তাব মধ্যযুগের নারী চরিত্রগুলির মধ্যে দেখা যায় না বললেই চলে। নিজ কার্যসিদ্ধির জন্য বিবিধ কৌশল অবলম্বন করে সে। এমনকি আজিজকে হত্যার পরিকল্পনা থেকেও বিরত হয় না জোলেখা। এই অংশের বিশদ বিবরণ পাঠ করলে জোলেখা - চরিত্রের মেজাজ স্পস্ট হয়,

''কিছু মাত্র না করিঅ আজিজের ভীত।

আজিজ মারিতে আম্হি পারিব ইঙ্গিত।।

বিষ দিয়া মারিব করিয়া ঘোর মতি।

চৈতন্য হারাই তার পরলোক গতি।।

বহু ধন ভাণ্ডার আছএ মোর পাশ।

দান ধর্ম করিলে হইব পাপ নাশ।।''[৩০]

(পৃষ্ঠা - ২০৩, প্রাগুক্ত)

জীবহত্যা করলে মহাপাপে পতিত হবার ভয়ও তার মনে আছে, তাই সে তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায়ও আগে থেকেই ভেবে রাখছে। অবগুণ্ঠিত কোমল স্বভাব যে নারী-চরিত্র অবলোকন করতে আমাদের চোখ অভ্যস্ত, সেই ইমেজকে কবি সম্পূর্ণ নস্যাৎ করেছেন

জোলেখা চরিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে। পঞ্চদশ শতকের কবি হিসেবে শাহ মুহম্মদ সগীর এভাবেই বোধহয় যুগধর্মকে অতিক্রম করে গেছেন। জোলেখা চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য এত বেশি প্রখর সেজন্যই হয়তো ইউসুফের চরিত্রকে তার পাশে অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্প্রভ দেখায়। প্রচলিত সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে কাব্যে উপস্থিত হয় ইউসুফ। জোলেখা হয়ে ওঠে ব্যতিক্রমী। শেকস্‌পীয়র রচিত 'ম্যাকবেথ' নাটকে লেডি ম্যাকবেথ চরিত্রের মধ্যেও ধারাবাহিক হত্যালীলার পরবর্তী পর্যায়ে এক অনুশোচনাজনিত মানসিক বিকৃতি লক্ষ করা যায়। নাটকের পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে তাকে বলতে শোনা যায়,

"Here's the smell of the blood still

all the perfumes of Arabia will not

sweeten this little hand. oh, oh, oh!"[৩১]

(William Shakespeare, Macbeth, 1606,

Page - 108)

বিবিধ কৌশলের বশবর্তী হয়েও জোলেখা তার কাঙ্ক্ষিত প্রেমিককে লাভ করতে না পেরে মিথ্যা অপবাদ আনে তার নামে। কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় ইউসুফ। জলিখার মিথ্যাচারণ প্রসঙ্গে সগীর এখানে বলেছেন,

''নারীর কপট ভাব করুণা সঞ্চিত।

মিছা কথা সাচা করে জানিতে নিশ্চিত।।"[৩২]

(পৃষ্ঠা - ২১৪, ইউসুফ জোলেখা)

জোলেখার স্বামী আজিজ তার স্ত্রীর মিথ্যা কথাকেই সত্য বলে গ্রহণ করে ইউসুফের প্রতি নির্দেশ দেয়,

''ইছুপের অঙ্গত প্রহার কর অতি।।'[৩৩]

(পৃষ্ঠা - ২১৪, প্রাগুক্ত)

চতুর্থ দৃশ্যে পুনরায় জোলেখার অনুশোচনা পরিলক্ষিত হয়। ইউসুফকে কারাগারে বন্দী করে তার হৃদয় অনুতপ্ত।

''ন বিচারী আপে মর্ম করিলুঙ অপকর্ম

হইলুঙ মন দুক্ষে ভোর।।''[৩৪]

(পৃষ্ঠা - ২২৩, প্রাগুক্ত)

জোলেখার বহুমাত্রিক মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় সমগ্র কাব্য জুড়ে। সে-ই হয়ে উঠেছে ঘটনাসমূহের নির্ধারক শক্তি।

বলা বাহুল্য, শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ-জোলেখা কাব্য যেসব হিন্দী ফারসী কবির কাব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত, সেসব কাব্যের কবিরা সুফী ধর্মমতের পরিপোষক ছিলেন। বাঙালী কবি সগীর তাঁদের আধ্যাত্মিক প্রেমকাব্যকে লৌকিক পর্যায়ে নিয়ে আসলেও তাঁর কাব্যেও অল্পবিস্তর সুফীধর্মের উপাদান উপস্থিত আছে। সুফী ধর্মের রূপক তত্ত্বের আধারে আমরা যদি জোলেখা চরিত্রের পর্যালোচনা করি তাহলে এক অন্য মাত্রা পাওয়া যায়।

শরিয়ত মতে, আল্লাহ-এর সঙ্গে জীবের দ্বৈতসম্পর্ক। আল্লাহ জীব সৃষ্টি করেছেন।

মৃত্যুর পর জীব আল্লাহ-এর কাছে ফিরে যায়। অন্যদিকে, সুফী ধর্মমতালম্বীদের কাছে আল্লাহ ও জীবের মধ্যে সম্পর্ক অদ্বৈত। মৃত্যুর পর জীবাত্মা অনন্ত পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়। প্রেমিক প্রেমিকা বা আশিক-মাশুকের যে সম্পর্ক জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্কও সেইরূপ। আল্লাহ অর্থাৎ স্রষ্টা প্রেমময়। প্রেমের পথই তার পথ। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমময় মিলন ঘটলে 'ফানাফিল্লাহ' বা আত্মলীনতা ঘটে। সুফীমতে, পার্থিব কামময় প্রেম ক্রমিক পর্যায়ে অপার্থিব কামহীন প্রেমময়তায় অবতীর্ণ হয়।

শাহ মুহম্মদ সগীর 'পুস্তক রচনার কথা'য় লিখেছেন,

''বচন রতন মণি জতনে পুরিআ।
প্রেম রসে ধর্ম বাণী কহিমু ভরিয়া।।
ভাবক ভাবিনী হৈল ইছুফ জলিখা।
ধর্মভাবে করে প্রেম কিতাবেত লেখা।।
ন হৈতে প্রেমক ভাব ইছুফ অন্তর।
জলিখা মজিল তাক বিরহ সায়র।।
পুরাণ কোরান মধ্যে দেখিলুঁ বিশেষ।
ইছুফ জলিখা বাণী 'অমৃত' অশেষ।।''[৩৫]

(পৃ - ১১৫-১৬, প্রাগুক্ত)

'প্রেমরসে ধর্মবাণী কহিমু ভরিয়া' - এই লাইনটি কবির মানসিকতাকে বোধগম্য করার জন্য

যথেষ্ট। সুফীভাবনার জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের সঙ্গে কবি মিলিয়ে দিয়েছেন,

'ভাবক ভাবিনী হৈল ইছুফ জলিখা'।

(পৃষ্ঠা-১১৬, প্রাগুক্ত)

সুফীতত্ত্বের নিরিখে জোলেখা চরিত্র পুনর্বিচার করলে দেখা যায়, পরমাত্মা অর্থাৎ ইউসুফের প্রতি তার অদম্য প্রেম কতটা নির্ভেজাল হয়ে উঠছে। ইউসুফ ও জোলেখা প্রকৃত অর্থেই পরমাত্মা ও জীবাত্মার দ্যোতক হয়ে উঠেছে। কাব্যের বিভিন্ন অংশের উপর ভিত্তি করে এই বক্তব্যের আরও কিছু প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে।

কাব্যে দেখা যায় ইউসুফকে জোলেখা স্বপ্নে তিনবার দর্শন করে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ভুলবশত বিবাহ করে আজিজকে। এর ফলে তার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। জোলেখার আত্মবিলাপ অংশের পরেই দেখা যায় যে তার মূর্ছা ঘটে। এ সময় অন্তরীক্ষ থেকে আকাশবাণী শ্রুত হয়,

''উঠ উঠ আয় কন্যা তাপিত হৃদয়।

তোহ্মার মনের বাঞ্ছা পূরিব নিশ্চয়।।

আজিজ মিছির তোর নহে মনস্কাম।

সুখ ভোগ তার সঙ্গে হইবেক বাম।।

আজিজ মিছির তোর পতি মাত্র লেখা।

তার যোগে হৈব তোর প্রভু সনে দেখা।।''[৩৬]

(পৃষ্ঠা - ১৫৩, প্রাগুক্ত)

শেষ চরণের 'প্রভু' শব্দটির পাঠান্তরে 'পতি' এই শব্দটিও পাওয়া যায়। অর্থাৎ, বোঝা যাচ্ছে ইউসুফের সহিত জোলেখার মিলনের পথে আজিজ মিছির এক উপলক্ষ্য মাত্র। 'প্রভু' অর্থাৎ স্রষ্টারূপী আল্লাহ্ বলতে ইউসুফকেই এখানে বোঝানো হয়েছে। দৈববাণী কিম্বা আকাশবাণী, এসব প্রসঙ্গ এনে কবি সগীর পরমাত্মার অনুষঙ্গকেই এনেছেন কাব্যে। 'নিঃসঙ্গ জোলেখা সম্বন্ধে' কবির মন্তব্য অংশেও এই অন্তরীক্ষ বাণীর কথা পুনরায় মনে করিয়ে দেওয়া হয়। লৌকিক প্রেমকাহিনির অন্তরালে এভাবে কাজ করে যায় সুফীতত্ত্বের নিগূঢ় ধ্যান-ধারণা। অলৌকিক উপাদানের ব্যবহার একারণেই কাব্যে বারংবার এসে পড়ে। স্বপ্ন, অন্তরীক্ষবাণী, অবলা শিশুর মুখে বাক্ ক্ষমতা, মূক পশুর মুখে মানুষের মতো কথা বলা প্রভৃতি প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

'কারাগারে ইউসুফ ঃ শিশুর সাক্ষ্য' অংশে দেখা যায় জোলেখার মিথ্যা অপবাদে ইউসুফ কারাগারে শাস্তিলাভ করে। পরম ঈশ্বর কর্তৃক অন্তরীক্ষ থেকে বাণী শোনা যায় যে টঙ্গীর ভেতর এক সখীকন্যার তিনমাসের শিশুর সাক্ষ্য থেকে প্রকৃত ঘটনার বিবরণ পাওয়া যাবে। তিনমাসের শিশুর মুখে কথা - এ এক অত্যাশ্চর্য বিষয়। কিন্তু কবি এই অলৌকিক ঘটনার ব্যবহার করেছেন ইউসুফের পরমাত্মা-রূপ প্রমাণ করবার জন্য। এখানে দেখা যায়,

''শিশু তরে আজিজে পুছিল কথা তত্ত্ব।
পরমার্থ তোহ্মাত সকল আছে ব্যক্ত।।

তোহ্মার অন্তর ভাব এহি পাপ-পুণ্য।

কহত স্বরূপ করি কার দোষ গুণ।।” [৩৭]

(পৃষ্ঠা - ২১৫, প্রাগুক্ত)

এভাবে শিশুর থেকে সত্যভাষণ শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করে আজিজ। এই ঘটনা থেকেও শাহ মুহম্মদ সগীরের মনোবাসনা বুঝতে পারা যায়। কেবলমাত্র সাধারণ মানুষ হিসেবে তিনি ইউসুফকে দেখেননি। পরমাত্মা-জীবাত্মার সম্পর্ক আরোপ করতে চেয়েছেন নিজ কাব্যের নায়ক-নায়িকার উপর।

ষষ্ঠ দৃশ্য ‘স্বপ্ন ব্যাখ্যাতা ইউসুফের কারামুক্তি’তেও দেখা যায় এক স্থানে আছে,

‘‘অন্তর্যামী ইছুফে জানএ সব তত্ত্ব।

বিধি মোরে ভ্রম কৈলা তাহান মহত্ত্ব।।” [৩৮]

(পৃষ্ঠা - ২৩১, প্রাগুক্ত)

ইউসুফকে এখানে সরাসরি অন্তর্যামী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুফী ধর্মের তত্ত্বকথা কাব্যমধ্যে নিহিত আছে বলেই জোলেখার বার্ধক্য ও অন্ধত্বলাভের পরও আবার তার যৌবনপ্রাপ্তি ঘটে। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মাকে মিলিত হবার জন্য জীবাত্মাকে অনেক বাধা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। জোলেখাও সমূহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে আত্মপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। স্বামী উপস্থিত থাকতে পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হলে আমরা তাকে অসতী বলি। কিন্তু এই অংশেই কবিকে বলতে শোনা যায়,

''তুন্হি হেন সতী নহি এ তিন ভুবনে।

এহি অপরাধ মোর ন লইবা মনে।।''[৩৯]

(পৃষ্ঠা - ২৪৩, প্রাগুক্ত)

জোলেখা চরিত্র যে একেবারেই কলুষিত নয়, তা বোঝা যায় সহজে। কবি শাহ মুহম্মদ সগীর, ইউসুফ - জোলেখার প্রেমের সমর্থনে বেহে্শত থেকে ফেরেস্তারও আগমন ঘটিয়েছেন,

''হেন কালে ফিরিস্তা আইল শীঘ্রগতি।

পরম ঈশ্বর আজ্ঞা কহিলা সম্প্রতি।।

শুনহ ইছুফ তুন্হি হঅ ততপর।

জলিখা তোহ্মার পত্নী জন্ম জন্মান্তর।।''[৪০]

(পৃষ্ঠা - ২৪৫, প্রাগুক্ত)

ফেরেস্তার এই বাণী শোনার পর আর কোনও সংশয় থাকে না যে কাব্যকাহিনির প্রয়োজনেই এত বাধা-বিপত্তির বিড়ম্বনা ঘটেছে। সুফী তত্ত্বের রূপকে যে নির্ভেজাল প্রণয় উপাখ্যান কবি উপস্থাপন করতে চেয়েছেন তা যথেষ্ট মানবিক গুণ সম্পন্ন হলেও তত্ত্বকথাও একেবারে বাদ পড়ে যায়নি।

'ইউসুফ-জোলেখার বিবাহ ও বাসর' অংশে এক জায়গায় পাওয়া যায়,

''সকল বয়ান ভরি দোহো এক চিত্ত করি

আনে আন নিরক্ষএ মুখ'' [৪১]

(পৃষ্ঠা - ২৫১, প্রাগুক্ত)

যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের জন্য এত আততির সৃষ্টি হয়েছিল তার যেন নিরসন ঘটে এই চরণগুলির মধ্যে দিয়ে। 'পারস্য-প্রতিভা'র এক স্থানে দেখতে পাওয়া যায়,

> ''ইউসুফ যে নিত্য বর্ধনশীল সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন উহার রীতি হইতে আমি জানি প্রেমই জোলায়খাকে পর্দার বাহির করিয়াছে। অর্থাৎ ইউসুফের রূপের মতই পরমাত্মার সদা-বর্ধিষ্ণু রূপই তাহার আশেকদিগকে বিশুদ্ধ অস্তিত্বের আবরু হইতে বাহির আসিতে বাধ্য করিয়াছে।''[৪২]

(পৃষ্ঠা-৩৩৩, পারস্যপ্রতিভা)

এই তত্ত্ব মাথায় রেখেই ইউসুফের প্রতি জোলেখার এই ক্রমবর্ধমান আসক্তির যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। পরম সৌন্দর্যের প্রতি জীবাত্মার যে অন্বেষণ, জোলেখার প্রেমময়তাও তারই দ্যোতক। তবে একইসঙ্গে একথাও অনস্বীকার্য যে হিন্দী বা ফারসী কবিদের মতো বাঙালী কবি শাহ মুহম্মদ সগীর কাব্যকে আধ্যাত্মিক স্তরে তূরীয় মার্গে নিয়ে যেতে পারেননি, প্রচেষ্টা করেছেন মাত্র। সুফী কবি রূমীর মতানুসারে, সেই মহাজনই ধন্য যিনি প্রেমকে এবং পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য গৃহ, ধন ও রাজ্যসুখ বিসর্জন দিয়েছেন।

> ''আয় খোনকে জানী কে বহরে ইশক ও হাল
> বয়্‌ল কার্‌দ খান ও মান ও মোলক ও মাল।[৪৩]

(পারস্য-প্রতিভা, পৃ - ২৮২)

সগীরের কাব্যেও জোলেখার ইউসুফকে পাবার জন্য এধরনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বার্ধক্যে উপনীত হয়েও সে লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় না। দেবতার প্রতিও সে কীভাবে বিমুখ হয়েছে নিম্নলিখিত চরণগুলি থেকে তা বোঝা যায়,

''পাষাণ ভাঙ্গিয়া আজি করিমু চৌখণ্ড।
ব্যর্থে সেবা কৈলুঁ তোক জানিলূঁম ভণ্ড।।
সহজে পাথর তুহ্মি জানিলুঁ ধারণ।
নিষ্ফল চরিত্র তোক সেবি অকারণ।।''[৪৪]

(পৃষ্ঠা - ২৪০, ইউসুফ জোলেখা)

এভাবে মূর্তিকে চুরমার করে জোলেখা পরম ঈশ্বর নিরঞ্জনের সেবায় আগ্রহী হয়েছে। সবকিছুর উপর আস্থা হারালেও সে ইউসুফকে বিস্মৃত হতে পারেনি। তাই সে নির্দ্বিধায় বলে উঠতে পারে,

''ইছুফের জেহি মতি সেহি মোর গতি।
পূর্ব পন্থ পরিত্যাগ করিলুঁ সম্প্রতি।।''[৪৫]

(পৃষ্ঠা - ২৪১, প্রাগুক্ত)

সকাম প্রেম থেকে এভাবেই সে নিষ্কাম প্রেমের দিকে যাত্রা আরম্ভ করেছে। ধনসম্পদ, যৌবন সবকিছু শেষ হলেও সে প্রেমিককে ত্যাগ করতে পারেনি। মানবিক গুণের নিরিখে এবং তত্ত্বরূপকের আশ্রয়ে এভাবে জোলেখা হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ প্রেমের প্রতিমূর্তি। ইউসুফের

অর্থাৎ পরমাত্মার দিকে জোলেখার অর্থাৎ জীবাত্মার যাত্রার বিভিন্ন স্তর এই কাব্যে উন্মোচিত হয়েছে। 'যাত্রা' এই মোটিফটি সুফীতত্ত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কালান্দার আবদুর রহমান সিদ্দিকির লেখা 'Finding, Losing - and Finding - The Way' প্রবন্ধে দেখতে পাওয়া যায়,

"... Sufism is seen and described by Sufies as a journey, or a series of journeys. There is a path, and a Guide. What confuses the ordinary person about this journey is, for instance, is the journey literal or metaphorical? In fact it can be both. The Sufi aspirant may undertake long and trying journeys to obtain completion. There is an inner as well as an outer journey. Therefore a sufi journey must be under stood in both senses. This is a parallel to the tradition that there is a Great struggle and a Lesser struggle. One is of the body, the other is the mind."[৪৬]

(The Sufi Mystery, Page - 7)

এই বক্তব্যের সঙ্গে জোলেখার কার্যকলাপ মিলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে প্রথম থেকেই সে স্বপ্নে ইউসুফকে দেখে নিজেই প্রেমিকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। পর্যায়ক্রমে সে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে ইউসুফের জন্যই। এমনকি অন্ধত্বলাভ এবং বার্ধক্যে উপনীত হয়েও জোলেখার অভিযাত্রা অবিরাম চলতে থাকে। মানসিক এবং শারীরিক এই দুই দিক থেকেই সে অনবরত সংগ্রাম করে অভীষ্টলাভের উদ্দেশ্যে। সুফীতত্ত্বের জীবাত্মার 'যাত্রা'র সঙ্গে

সমান্তরালভাবে মিশে যায় জোলেখার ইউসুফের প্রতি যাত্রা। আমাদের তথাকথিত সামাজিক অনুশাসনের ভিত্তিতে বিচার করলে যে জোলেখা চরিত্রকে এক অর্থে কলঙ্কিত বলে মনে হতে পারে, সুফী তত্ত্বের আধারে তার চরিত্রের এক ভিন্ন মাত্রা পাওয়া যায়। 'পুস্তক রচনার কথা'য় কবির লিখিত

'ভাবক ভাবিনী হৈল ইছুফ জলিখা' [৪৭]

(পৃষ্ঠা - ১১৬, প্রাগুক্ত)

— চরণটির প্রভাবকে অতি কৌশলে প্রয়োগ করে এক ভিন্ন পাঠ তৈরী হতে পারে এই কাব্যের। তবে একই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে সমসাময়িক সমাজ চেতনা যেকোনো সাহিত্যিকের শিল্পসৃষ্টিকে প্রভাবিত করে। শাহ মুহম্মদ সগীরও এর ব্যতিক্রম নন। সুফীতত্ত্বের নিরিখে যদি 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের এক পাঠ নির্মিত হয়, তবে সামাজিক লিঙ্গচেতনা কীভাবে কাব্যমধ্যে সক্রিয়, তার উপর ভিত্তি করেও গড়ে উঠতে পারে এই কাব্যের আরেকটি পাঠ।

নব্বই এর দশক থেকে ফরাসী নারীবাদী দার্শনিকদের মধ্যে সাহিত্য-সমালোচনা নিয়ে নানাবিধ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। জুলিয়া ক্রিস্তেভা, লুস ইরিগারে এঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁদের মতে, সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো আমাদের সাহিত্যিক কাঠামোও পুরুষচালিত। পুরুষ সাহিত্যিকদের রচনায় মেয়েদের অবদমনই অধিকমাত্রায় উপস্থাপিত হয়। মেয়েদের নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনার অভাব রয়েছে সাহিত্যে। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তারা প্রাচীন পাশ্চাত্য

দর্শন সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছেন। প্লেটো থেকে শুরু করে ফ্রয়েড পর্যন্ত সকল দার্শনিকের সূত্রও পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান ধারণায় নির্মিত। এই বক্তব্যকে মনে রেখে আমরা পঞ্চদশ শতকের কাব্য 'ইউসুফ জোলেখা'কে বিচার করার প্রচেষ্টা করব। কাব্যটি একজন পুরুষ সাহিত্যিকের রচিত বলে কি নারীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এখানে সম্পূর্ণভাবে বর্জিত হয়েছে? পুরুষতান্ত্রিক মনন কাব্যে কতটা সক্রিয়? এসব প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের খাতিরে কাব্যের ভেতরে পুনরায় প্রবেশ করা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

আল্লাহ ও রসুল বর্ণনা, মাতা পিতা ও গুরুজন বর্ণনা, রাজ-প্রশস্তি, পুস্তকরচনার কথার পরেই সগীর জোলেখার জন্ম বৃত্তান্তে এসে পড়েছেন। জোলেখার রূপ- বর্ণনা' ও 'জোলেখার আভরণ' অংশ পর্যন্ত কবির বয়ান পাওয়া গেলেও 'জোলেখার প্রথম স্বপ্ন', 'জোলেখার দ্বিতীয় স্বপ্ন', 'জোলেখার প্রেমাভিব্যক্তি', 'জোলেখা কর্তৃক স্বপ্নাবির্ভূত মূর্তির অনুধ্যান', 'বিরহিনী জোলেখার কথা-চিত্র', 'জোলেখার তৃতীয় স্বপ্ন', 'স্বপ্নে আলাপ' এই সাতটি অধ্যায় জুড়ে জোলেখার নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যক্ত হয়েছে। পুরুষ সাহিত্যিকদের রচনায় মেয়েদের অভিজ্ঞতার কথা অনুপস্থিত থাকে বলে যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, শাহ মুহম্মদ সগীরের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হচ্ছে না। এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে কোনো মহিলা সাহিত্যিকের রচনায় জোলেখার আত্ম অনুভূতি আরও বেশি বাস্তবসম্মত হতে পারতো কিনা। এই যুক্তি, খণ্ডনের জন্য নিম্নে জোলেখা কর্তৃক প্রদত্ত কয়েকটি খণ্ডচিত্র তুলে ধরা হল।

''নাভি সরোবর জেন অমৃতের কুম্ভ।

মহাপুণ্য স্থলী তথি ত্রিজগতে মুণ্ড।।

কটিদেশ সিংহ জিনি অতুল সরুয়া।

গজ কুম্ভ থল জিনি নিতম্ব গুরুয়া।।

মনুষ্যের প্রধান পুরুষ অবতার।

রূপে গুণে অসীম মহিমা তনুসার।।"[৪৮]

(পৃ-১২২, প্রাগুক্ত)

নারী কর্তৃক পুরুষের এহেন রূপবর্ণনা মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে বিরল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা এর বিপরীত চিত্র দেখতে পাই।

জোলেখার তীব্র কাম অনুভূতির ফলে কী অবস্থা হয়েছে তার প্রকাশ কাব্যে বারংবার ঘটেছে।

এরপরেও দেখা যায় ভাগ্যক্রমে জোলেখা ইউসুফের পরিবর্তে আজিজকে বিবাহ করে এবং বিপর্যস্ত হয়। আত্মবিলাপ অংশে শুনতে পাওয়া যায়,

"হা হা মোর কর্ম কি লেখিলা ধর্ম

দৈবদশা মোর মন্দ।

দেখাই একরূপ হইলেক আলোপ

মোহোরে দিয়া গেল ধন্ধ।।"[৪৯]

(পৃ-১৫০, প্রাগুক্ত)

স্বপ্নে দেখা পুরুষের রূপের সঙ্গে বাস্তবে যাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছে তার রূপের কোনো

সামঞ্জস্য না থাকায় জেলেখার এই আত্মবিলাপ। নারীর ভাষ্যে এই সৎ স্বীকারোক্তি আমাদের তথাকথিত সমাজ পরিকাঠামোয় সত্যিই দুর্লভ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর কণ্ঠস্বরকে অশ্রুত রাখার জন্য সব ধরণের প্রচেষ্টা চালায়। এমনকি নারীর ব্যক্তিত্ব, উপস্থিতি সবকিছুকেই কম গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সেরকম সমাজ চেতনায় জোলেখার স্বর বাস্তবিকই ব্যতিক্রমী স্বর হিসেবে গণ্য হতে পারে। শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যে পুরুষ চরিত্রদের তুলনায় তাই জোলেখাই হয়ে উঠেছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রাধা চরিত্র ব্যতীত জোলেখার মতো এক ব্যক্তিত্বপূর্ণ নারী চরিত্রের উপস্থিতি আর লক্ষ করা যায় না বললেই চলে। লিসা টাট্টল তাঁর 'Encyclopedia of Feminism' (১৯৮৬) গ্রন্থে নারীবাদী তত্ত্ব বলতে বুঝিয়েছেন, "new questions of old texts" নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনার অনেকগুলি লক্ষ্য থাকে, সেগুলি হল, —

"1) To develop and uncover a female tradition of writing,

2) to interpret symbolism of women's writing so that it will not be lost or ignored by the male point of view,

3) to rediscover old texts,

4) to analyze women writers and their writings from a female perspective,

5) to resist sexism in literature, and

6) to increase awareness of the sexual politics of language and style." [৫০]

(Lisa Tuttle : Page 184)

এর মধ্যে ৩, ৫, ৬ নং সূত্রগুলি আমাদের মাথায় রাখতে হবে। পুরোনো গ্রন্থাবলীকে পুনর্মূল্যায়ন করা নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা, সাহিত্যে লিঙ্গ বৈষম্যকে প্রতিহত করা এবং সর্বোপরি সাহিত্যের ভাষা এবং বাচনভঙ্গির লিঙ্গ-রাজনীতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি — এসবই ভীষণ প্রাসঙ্গিক।

পঞ্চদশ শতকে সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের বাক্‌ভঙ্গিকে অনেকাংশেই লিঙ্গ-রাজনীতি মুক্ত বলে দাবী করা যায়। প্রথম থেকেই জোলেখার সক্রিয় ভূমিকা নারী হিসেবে তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে তোলেনি। নায়িকার রূপবর্ণনার বিশদ বিবরণের পাশাপাশি নায়কের রূপবর্ণনাও বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কাব্যের শেষ দিকে দেখা যায় জোলেখার তুলনায় ইউসুফ অনেক বেশি সপ্রতিভ হয়ে যায়। মিসরে সে সদর্পে রাজত্ব করতে থাকে। তার রাজত্বে প্রজাগণেরও কোনো অভাব - অভিযোগ থাকে না। জোলেখার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নতর হয়ে দাঁড়ায়। সে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হতে থাকে। দুই প্রধান চরিত্রের এই উত্থান-পতন কি শুধুই ঘটনার প্রয়োজনে? নাকি এখানে কাজ করে যায় পুরুষ সাহিত্যিকের ইচ্ছাকৃত কোনো লিঙ্গ রাজনীতি? প্রশ্ন থেকেই যায়। এমনকি জোলেখার অবনতি ঘটে সর্বক্ষেত্রে — রূপ, যৌবন, ধন, সম্পত্তি সবদিক থেকেই সে পরিণত হয় এক অতি সামান্য 'নগরুয়া নারী' মাত্রে। অথচ এক সময়,

''জার কেশ সৌরভ সমীর সমুদিত।

আউল বাউল অতি কুভেস চরিত।।

জার দন্ত বিজুত চমকে ছটফট।

দেখি দূর জাএ তার দশন বিকট।।"[৫১]

(পৃ-২৩৮, প্রাগুক্ত)

এতটা করুণ অবস্থা কি সত্যিই তার কাম্য ছিল? নাকি লেখকের পুরুষতান্ত্রিক মনস্তত্ত্ব, অতিরিক্ত সপ্রতিভ জোলেখাকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়েছে? এছাড়াও আরও একটি প্রসঙ্গের কথা এখানে উল্লেখ করতেই হয়, বৃদ্ধা অবস্থায় জোলেখার সঙ্গে ইউসুফের সাক্ষাৎ হলে, ইউসুফ তাকে বলে,

"কহ তোহ্মা মনেত কি আছে সহসাত।।

ধর্ম আজ্ঞা তোহ্মার পূরিব মনস্কাম।"[৫২]

(পৃ-২৪৪, প্রাগুক্ত)

পুরুষের দ্বারা নারীর ইচ্ছাপূরণ - এই ধারণা পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর এক সহজাত চিহ্নকে বহন করে। এরপর জোলেখা তার কাছে তিনটি আকাঙ্ক্ষা প্রার্থনা করে। যথাক্রমে,

১) "তুহ্মি ভক্ত পরম ঈশ্বর মনুগত।
বর মাগ হউ আহ্মা নয়ন মুকত।।",

২) "সপ্ত খণ্ড টঙ্গীতে আছিল জেহি রূপ।।
সেহি রূপ জৌবন মোর পুনি দেঅ বিধি।" এবং

৩) ''কন্যা বোলে তোহ্মা পদতলে মোর ছায়া।

.....

পদ অবলম্বে মোর রাখহ জীবন।।''[৫৩]

(পৃ-২৪৪, ২৪৫, প্রাগুক্ত)

ইউসুফের কাছে জোলেখা তার হৃত দৃষ্টি, রূপ-যৌবন এবং সর্বোপরি পদতলে জীবন অতিবাহনের অঙ্গীকার দাবি করে এবং তার আকাঙ্ক্ষা পূরণও হয়। এসবই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। পুরুষের দেওয়া দৃষ্টিতে নারীর কাছে জগৎ দৃশ্যমান হয়। নারী বিগতযৌবনা হলে পুরুষের কাছে সে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাই দ্বিতীয় স্বপ্নপূরণের অনুসারী হিসেবেই এসে পড়ে তৃতীয় স্বপ্নপূরণের সদিচ্ছা। অর্থাৎ পুরুষের অনুমতি সাপেক্ষে তার পদতলে নারীর অতিকাঙ্ক্ষিত জীবনযাপন। জোলেখার এই পর্যায়ক্রমিক আকাঙ্ক্ষা ও তা পূরণের ইতিহাসে নিহিত থাকে আমাদের অতি পরিচিত পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা। যা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেননি পঞ্চদশ শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর।

প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত মিশেল ফুকোর ক্ষমতার রাজনীতি সম্পর্কিত সূত্র মাথায় রেখে পঞ্চদশ শতকের 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তিতে ক্ষমতার মিথষ্ক্রিয়াকে অন্বেষণ করার প্রচেষ্টা করবো।

'মণিরু' সাধুর কাছ থেকে ইউসুফকে ক্রয় করার জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা নিয়ে বহু বণিক এগিয়ে আসে। কিন্তু ক্ষমতার আধিপত্য বিস্তার করে, পিতৃদত্ত মণিমাণিক্য দিয়ে ওজন করে

ইউসুফকে ক্রীতদাস হিসেবে কিনতে আগ্রহী হয় জোলেখা। আজিজকে জোলেখা বলে,

''মোর পিতা দিছে জথ কনক রতন।

ইছুফ কিনিব আহ্মি দিয়া সেই ধন।।

এক এক মাণিক্য মিছির মূল্য জান।

সেহি রত্ন আনি দিলা সাধু বিদ্যমান।।''[৫৪]

(পৃ-১৮১, প্রাগুক্ত)

আর্থিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করেই জোলেখা ইউসুফকে ক্রয় করে। যার রূপ দেখে সে মূর্ছিত হয়েছিল, তাকে ক্ষমতাবলে কিনে নিয়ে তাকে লাভ করবার নানাবিধ প্রয়াস চলতে থাকে। ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটিয়েই জোলেখা মিথ্যা অপবাদে তাকে কারাগারে প্রেরণ করে। লিঙ্গ বৈষম্যের পেছনে যে ক্ষমতার সূক্ষ্ম রাজনীতি কাজ করে যায় তা বোঝাই যাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের দ্বারা নারীর নিপীড়নের কারণ পুরুষ, ক্ষমতার মাপকাঠিতে এগিয়ে থাকে নারীর থেকে। এক্ষেত্রে নারী ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকায়, প্রান্তে থাকা পুরুষের অবদমনের চিত্র চোখে পড়ে। মানসিক ও শারীরিক দু'দিক থেকেই বিপর্যস্ত হতে দেখা যায় ইউসুফকে। এরপরে অবশ্য অবস্থান্তর ঘটে। ইউসুফ ধীরে ধীরে মিশরের আজিজে পরিণত হয়। কিন্তু জোলেখা যেভাবে ইউসুফকে অপমান করেছে, ইউসুফ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালীন জোলেখাকে বিপর্যস্ত করেনি। ভাগ্যক্রমেই সে রূপ যৌবনও অর্থহীন হয়ে পড়ে। কাব্যে জোলেখার ক্ষমতার একচেটিয়া আধিপত্যের বিকেন্দ্রীকরণের জন্যই হয়তো বা কবি শাহ

মুহম্মদ সগীরের এই প্রয়াস। একইসঙ্গে আবার কাজ করে গেছে সুফীতত্ত্বভাবনা। এই দুয়ের মিলিত প্রচেষ্টাতেই পুনরায় সবকিছু লাভের জন্য জোলেখাকে বরপ্রার্থনা করতে হয় ইউসুফের কাছে। ক্ষমতার কেন্দ্র যেমন সবসময় ধ্রুবক থাকে না — পরিবর্তনশীলতা তার যেমন এক অনিবার্য ধর্ম, সগীরের কাব্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ মেলে।

নারী চরিত্রের চরিত্রায়নের ক্ষেত্রে তিনি যে বহুমাত্রিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা আধুনিক উপন্যাসের চরিত্রের সমলক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। মেয়েদের কণ্ঠস্বরকে হারিয়ে যেতে দেননি সগীর। দৃপ্তকণ্ঠে তা হয়েছে উচ্চারিত। আবার কাহিনির প্রয়োজনে পুরুষকেও কর্তৃত্বে নিয়ে গেছেন। ক্ষমতার এরকম ভিন্নমুখী প্রায়োগিক কৌশল প্রশংসার দাবী রাখে, নিঃসন্দেহে।

তবে একইসঙ্গে আরও একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলে এই সুদীর্ঘ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায় তা হল ইউসুফ ও জোলেখার বিবাহ পরবর্তী অংশ থেকে কাব্যে ধীরে ধীরে জোলেখার কণ্ঠস্বর অবলুপ্ত হতে থাকে। এমনকি এই দম্পতির পুত্রলাভের পর কাহিনির দীর্ঘ অংশে জোলেখার নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই। গ্রন্থের শেষ অধ্যায় 'ইবন আমীনের সস্ত্রীক মিশর গমন' এ ইবন আমীনের স্ত্রী বিধুপ্রভাবতীকে আশীর্বাদের সময় একবারমাত্র জোলেখা বিবিকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। সমগ্র কাব্য জুড়ে যার আধিপত্য সবথেকে বেশি ছিল, তার এরকম আকস্মিক অদৃশ্য হয়ে যাবার কারণ কী? পরিবারে প্রবেশের পরমুহূর্ত থেকেই ঘটনাবৃত্তের কেন্দ্র থেকে প্রান্তে চলে আসা এবং তারপর একেবারে পরিধির বাইরে স্থানান্তর

— এটা কি জোলেখাকে কবির স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসন নাকি পুরুষতন্ত্রের সীমাবদ্ধতার চরমতম কোনো রূপ, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। পরিবার কাঠামোয় প্রচলিত ধারণা অনুসারে পুরুষই এককটির সর্বময় কর্তা, নারী তার অধীন। কেট মিলেট তাঁর 'সেক্সুয়াল পলিটিকস্' নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন,

> "When one group rules another, the relationship between the two is political, when such an arrangement is carried out over a long period of time it develops an ideology (feudalism, racism, etc) All historical civilizations are patriarchies : their ideology is male supremacy."[৫৫]
>
> (Kate Millett : Sexual Politics : P-111)

নারী ও পুরুষের মধ্যে যে লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতার রাজনীতি বহাল থাকে এই কাব্যেও অংশত তা বর্তমান। আজিজ হিসেবে ইউসুফ যখন রাজ্যশাসনে ব্যস্ত, জোলেখা তখন ধীরে ধীরে অদৃশ্য হতে থাকে। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে ইউসুফ ব্যস্ত থাকাকালীন পাঠককে অনুমান করে নিতে হবে ঘটনা প্রবাহে অনুপস্থিত জোলেখা তখন সংসারধর্ম পালন করছে। কাব্য শেষের কয়েকটি চরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে,

''মঙ্গলা করিয়া তবে জলিখা সুন্দরী।
অন্তস্পুর মৈদ্ধে কন্যা নিলা হস্তে ধরি।।

অন্যে অন্যে দুই দেবী সম্ভাষা আছিল।

বিধুপ্রভা জলিখার চরণ বন্দিল।।

প্রেমভাবে আলিঙ্গিয়া কোলে বসাইলা।

সন্তোষে জলিখা বিবি আশীর্বাদ কৈলা।।"[৫৬]

(পৃ-৩০৯,৩১০, ইউসুফ জোলেখা)

এইভাবে বিধুপ্রভাকে বধূরূপে বরণ করার স্ত্রী আচারের মধ্য দিয়ে জোলেখাকে কাব্যের পরিসমাপ্তিতে একবার উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। তবে পঞ্চদশ শতকের নিরিখে বিচার করলে দেখা যায় কবি শাহ মুহম্মদ সগীর যুগধর্মকে অনুসরণ করেছেন। কাব্যের শেষে যে জোলেখাকে আমরা লক্ষ করি তা আমাদের মনে স্থান পায় না, জোলেখার প্রকৃত পরিচয় লুকিয়ে আছে তার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে, প্রেমের প্রতি নিষ্ঠা ও একাগ্রতায়। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রাপ্ত বিশ্লেষণে পঞ্চদশ শতকের শাহ মুহম্মদ সগীরের সৃষ্ট জোলেখা তাই হয়ে ওঠে যুগোত্তীর্ণ চরিত্র।

তথ্যপঞ্জী

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য, সাহিত্য ও সভ্যতা প্রবন্ধ, (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৪০৬), পৃষ্ঠা ১৮০

২. শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ জোলেখা, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, নভেম্বর, ১৯৯৯), পৃষ্ঠা ৭১

৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৫

৪. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃষ্ঠা ৫০৭

৫. ইউসুফ জোলেখা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৬

৬. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, চর্যাগীতির ভূমিকা, (কলকাতা : ডি. এম. লাইব্রেরী, ডিসেম্বর ১৯৯৫), পৃষ্ঠা ২৪৫

৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৮

৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৫

৯. বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯), পৃষ্ঠা ১৯৫

১০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬১

১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭৭

১২. ইউসুফ জোলেখা, পৃষ্ঠা ১১৯

১৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯১

১৪. ইউসুফ জোলেখা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৯

১৫. ইউসুফ জোলেখা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩০

১৬. মধুসূদন দত্ত, বীরাঙ্গনা কাব্য, দ্বিতীয় সর্গ, সোমের প্রতি তারা, (কলকাতা : ঊষা পাবলিশিং হাউস) পৃষ্ঠা ৬, ৭

১৭. ইউসুফ জোলেখা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৩

১৮. বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯, পৃষ্ঠা ২৯।

১৯. পবিত্র কুরআন (বাংলা অনুবাদ), (কলকাতা : বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, মে, ২০১২) সূরা - ১২, রুকূ - ৩, পৃষ্ঠা ২৬০-২৬১

২০. ইউসুফ জোলেখা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৮

২১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭

২২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০৪

২৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০৫

২৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০৫

২৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯২

২৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯০

২৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯১

২৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯১

২৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০৩

৩০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০৩

৩১. William Shakespeare, Macbeth, 1606, shakespeare.mit.edu, Page 108.

৩২. ইউসুফ জোলেখা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১৪

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১৪

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২৩

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৫, ১১৬

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৩

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১৫

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩১

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৩

৪০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৫

৪১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫১

৪২. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, পারস্য প্রতিভা (ঢাকা : গ্রেট ইস্ট লাইব্রেরী, ১৯৬৫) পৃষ্ঠা ৩৩৩

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮২

৪৪. ইউসুফ জোলেখা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪০

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪১

৪৬. Nathaniel P. Archer edited The Sufi Mystery, (Octagon, 1980), Finding, Losing and Finding The Way, Page 7

৪৭. ইউসুফ জোলেখা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৬

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২২

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫০

৫০. Lisa Tuttle, Encyclopedia of Feminism, (Harlow : Longman, 1986) Page - 184

৫১. ইউসুফ জোলেখা,পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৮

৫২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৪

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৪, ২৪৫

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮১

৫৫. Kate Milett, Sexual Politics, (New York : Avon, 1971) Page 111

৫৬. ইউসুফ জোলেখা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩০৯-৩১০

চতুর্থ অধ্যায়

ষোড়শ শতকের মুসলিম কবির কাব্যে নারী

ছান্দোগ্যে বিরোচন বলেছেন — ''এই পৃথিবীতে দেহেরই পূজা করিবে। দেহেরই পরিচর্যা করিবে। দেহকে মহীয়ান করিলে এবং দেহের পরিচর্যা করিলেই ইহলোক ও পরলোক এই উভয়লোকই লাভ করা যায়।''[১]

(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন : ভারত সরকার প্রকাশিত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৮৯, ২৫৬)

গীতায় সাংখ্য ও যোগকে অভিন্ন বলা হয়েছে। সাংখ্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ হল যোগ। পতঞ্জলির যোগসূত্র অনুসারে ঈশ্বররূপ যে একটি তত্ত্বের নির্মাণ করেছেন, তার জন্যই এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ। বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যে চরম কথা ঘোষিত হয়েছে : আত্মাই ব্রহ্ম (বৃহদারণ্যক - স বা ইয়মাত্মা ব্রহ্ম। ৪।৪।৫, ৩।৭।১৪ ছান্দোগ্য : ৬।৮।৭)[২]

ভারতে প্রবেশ করে ইরানী সুফীরা ভারতীয় যোগ, দেহতত্ত্ব প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। যোগ ও দেহতত্ত্বের সঙ্গে সুফীসাধনার মেলবন্ধন ঘটিয়ে তাঁরা নতুন সুফীচর্যার অনুশীলন করেন। ভারতীয় যোগসাধনা সম্পর্কে ক্রমশ সুফীসাধকদের আগ্রহ বেড়েছে এবং সেই সূত্র ধরেই দেহ সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল ক্রমবর্ধমান হয়েছে। কায়া সাধনকে তাঁরা জিক্‌রের অনুকূল করে নিতেও প্রচেষ্টা করেছেন। ভারতীয় সুফী সাধন প্রণালীর ভাবধারা এসে পড়েছে সুফী সাহিত্যে।

পঞ্চদশ শতকের সুফী কাব্য শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যে নারীর

অবস্থান বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে। ষোড়শ শতকের বিশিষ্ট কবি দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত 'লায়লী মজনু' কাব্যকে কেন্দ্র করে মূলত বর্তমান অধ্যায়ের অবতারণা। কবির আবির্ভাবকাল নিয়ে বিদ্বানদের মধ্যে এখনও যথেষ্ট মতানৈক্য আছে। আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'লায়লী মজনু' কাব্যের ভূমিকাপ্রাপ্ত নানাবিধ তথ্যের প্রমাণে ও কিয়দংশ অনুমানের ভিত্তিতে তাঁকে ষোড়শ শতকের কবি বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

দৌলত উজির বাহরাম খানের এ কাব্যের আনুমানিক রচনাকাল ১৫৪৫-৫৩ খ্রিস্টাব্দ।[৩] 'লায়লী মজনু' কাব্যের আদি আবিষ্কারক আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ।

'লায়লী মজনু'র প্রেম-কাহিনি পারস্য কাব্যের একটি জনপ্রিয় লোক-কাহিনী। কমপক্ষে দশজন কবি এই একই কাহিনি নিয়ে ফারসীতে কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে চারজন খুবই বিখ্যাত।

১. নিযামী (১১৪৯-১২০৩ খ্রিঃ)

২. আমীর খুসরও (১২৩৫-১৩২৫ খ্রিঃ)

৩. জামী (১৪১৪ - ১৪৯২ খ্রিঃ)

৪. হাতিফী (মৃত্যু ১৫২১ খ্রিঃ)[৪]

(মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঃ বাংলা সাহিত্যের কথা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২, পৃষ্ঠা - ২৪৩)

আরব-পারস্য দেশ থেকে কাহিনি - বিন্যাস গ্রহণ করলেও দৌলত উজির বাহরাম খানের

রচনায় আরবি আবহের উপস্থিতি খুবই কম। হিন্দু-পুরাণের প্রতুল ব্যবহার কাব্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ইরাণীয় সুফী সংস্কৃতির মিশ্রণই এর মূল কারণ, অনুমান করা যেতে পারে।

'লায়লী মজনু' কাব্যের নারীর অবস্থানের স্বরূপ কী প্রকার ছিল তা পর্যালোচনা করতে গেলে কাব্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা আবশ্যক হয়ে ওঠে। কাব্যের নিবিড় পাঠ নির্মাণে টুকরো টুকরো ঘটনা-সূত্রের উপর আলোকপাত অত্যন্ত জরুরী।

মধ্যযুগের অধিকাংশ কাব্যে নায়কের জন্য বিরহতাপিত নায়িকার বারমাস্যা পরিলক্ষিত হয়। চৌতিশা ও বারমাসীতে নারীর বিরহ বিলাপ মধ্যযুগের কাব্য-কাঠামোর একটি বহুদর্শিত দৃষ্টান্ত। দৌলত উজির বাহরাম খান বিরচিত 'লায়লী মজনু' কাব্যে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। পুরুষের তথা নায়কের বারমাসী 'লায়লী মজনু' কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমাদের দেশীয় সাহিত্যে তিনজন নায়কের মধ্যে নারীসুলভ(?) বিরহ লক্ষণীয় — ঋগ্বেদে ঊষার জন্য পুরুরবার বিরহ, মেঘদূতে যক্ষের বিরহ এবং 'লায়লী মজনু' কাব্যে মজনুর বিরহ। আহমদ শরীফ কাব্যটির সম্পাদনায় ভূমিকা অংশে তাই বলেছেন, ''তাই একে 'বিরহ কাব্য' না বলে 'বিলাপ কাব্য' বলাই হয়তো সঙ্গত।''[৫]

(আহমদ শরীফ সম্পাদিত লায়লী মজনু, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা,

২০০৬, পৃষ্ঠা - ৪৭)

এই ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করলে কবি সম্পর্কে একটি বিষয় অনুমেয় হয়ে ওঠে যে আনুমানিক

ষোড়শ শতকে কলম ধরলেও যুগ-অনুপাতে তিনি আধুনিক ছিলেন। কারণ সামাজিক লিঙ্গের (gender) নিরিখে binary opposition বা dichotomy অনুযায়ী কিছু আচরণ বা বিশেষণ পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট, আবার কিছু নারীদের জন্য। যেমন লজ্জা, কান্না, আবেগপ্রবণ, কোমল স্বভাবের প্রভৃতির শব্দগুলি নারীর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানানসই এবং কঠিন, বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন, রাগী প্রভৃতি শব্দগুলি পুরুষসুলভ আচরণের সঙ্গে জড়িত বলে সমাজ-স্বীকৃত। এমতাবস্থায়, স্রোতের বিপরীত অভিমুখে চলে কাব্যের নায়কের বিরহ - সন্তপ্ত মূর্তি স্থাপন করা অনেকটা দুঃসাহসিক পদক্ষেপের পরিচয়ই বহন করে।

লায়লী - মজনু কাব্যে দেখা যায়, কোনো পুরুষের প্রতি অনুরক্ত হওয়া ছিল নারীর অপরাধ। তাই লায়লীর মায়ের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে শোনা যায় —

‘‘শতেক ভাবক তোর হোক কদাচিত।
ভাবিনী হইতে তোর না হএ উচিত।।
কুলের নন্দিনী হৈয়া নাহি কুললাজ।
কলঙ্ক রাখিলি তুই আরব সমাজ।।’’[৬]

(পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১০২, প্রাগুক্ত)

যুগধর্মকে অতিক্রম করে নয়, কাব্যের এই স্থানে গতানুগতিক মাতৃ চরিত্রের সঙ্গে লায়লী চরিত্রের মাও সমানভাবেই তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন —

''ঘরের বাহির হৈলে জানিতে কারণ।

প্রখর নূপুর দিলা কন্যার চরণ।।''[৭]

(পৃষ্ঠা ১০৪, প্রাগুক্ত)

মেয়েরা শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমেই বাড়ির চার দেওয়ালের চৌহদ্দির বাইরে যেতে সক্ষম হয়। তাই তার গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সব ক্ষেত্রেই শিক্ষালাভে বাধা সৃষ্টি করা হয়। তার কণ্ঠস্বর বা লেখার ক্ষমতাকে প্রতিহত করা হয়। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পায়ে শিকল বা বেড়ির এক ধরনের অলঙ্কৃত সংস্করণ নূপুর লায়লীর পায়ে পরানো হয়েছে, শুধুমাত্র তার গতিবিধি নির্ধারণের উদ্দেশ্যেই।

এছাড়া কন্যার সখীদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সতর্ক পাহারার জন্য। শুধু তাই নয়, নারী চরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তা ও পুরুষের চেয়ে নারীর হীনতা সম্বন্ধেও কোনো কোনো স্থানে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে।

নারীশিক্ষার প্রতিও গুরুত্ব বা উৎসাহ কাব্যমধ্যে অলক্ষণীয় ছিল — 'যুবতী বাখানি যদি পতিব্রতা নাম।'[৮] অন্যদিকে পুরুষের বিদ্যা শিক্ষালাভ সম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্য।

''ভাগ্যবন্ত পুরুষের বিদ্যা অলঙ্কার

বিদ্যা সে গলার হার বিদ্যা সে শৃঙ্গার।।

পুরুষ সুন্দর অতি রূপে অনুপাম।

গুণ না থাকিলে তার রূপে কিবা কাম।।''[৯]

(পৃষ্ঠাসংখ্যা - ৯২, প্রাগুক্ত)

মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করলেও তাদের উচ্চশিক্ষা দেবার উৎসাহ যে ছিল না তার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। সতী সাধ্বী ও পতিব্রতা হওয়াকেই নারীজীবনের আদর্শ হিসেবে গণ্য করা হত। কিন্তু অন্যদিকে পুরুষের শিক্ষার্জন সম্পর্কে বিপরীত অভিমত ব্যক্ত হতে দেখা যায়।

কাব্যমধ্যে 'পাঠশালায় লায়লী' নামক অধ্যায়েও আমরা দেখতে পাই লায়লীর বিদ্যাশিক্ষার পরিচয়ের পরিবর্তে তার রূপের বর্ণনাতেই দৌলত উজির বাহরাম খান অধিক মনোযোগী হয়েছেন।

''জিনিয়া বান্ধুলি ফুল অধর রঙ্গিমা।

রতিপতি - ধনু জিনি ভূরুর ভঙ্গিমা।।

নয়ান কটাক্ষ বাণে হানিল তপসী।

খঞ্জন গঞ্জন আঁখি পরম রূপসী।।

চাচর চামর জিনি মনোহর কেশ।

জাতিএ পদ্মিনী বালা সুচারু সুবেশ।।''[১০]

(পৃষ্ঠা - ৯৩, প্রাগুক্ত)

নারীদের মধ্যে আঙ্গিক লক্ষণে পদ্মিনী জাতিয়া নারীই শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচিত হত। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র'-এ আমরা এ ধরনের নারীর পরিচয় পাই।

"... so the Hindoos describe the Padmini or Lotus woman as the type of most

perfect feminine excellence as follows : She in whom the following signs and symptoms appear is called a Padmini. Her face is pleasing as the full moon; her body, well clothed with flesh, is soft as *shiras* or mustard flowers, her skin is fine, tender and fair as the yellow lotus, never dark coloured ... such then, is the Padmini or Lotus woman."[১১]

(Pg-27, The Kamasutra of Vatsayana, translated by Sir Richand F. Burton, Jaico Publishing House, 1976)

আলোচ্য 'পাঠশালায় লায়লী'র পরবর্তী অধ্যায় 'লায়লীর রূপ' দীর্ঘছন্দ রাগসুহির মাধ্যমে তার রূপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা কবি অনায়াসে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই রূপবর্ণনা সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃতানুসারী। এমনকি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল কবির কাব্যেও এই রীতির অনুসরণ লক্ষ করা যায়।

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যেও রাধার রূপের বর্ণনা সর্বাধিক। কবি, শ্রীকৃষ্ণ ও বড়াই-এই তিনজনের বয়ানেই উপমা সহযোগে রাধার রূপ বর্ণিত হয়েছে। এমনকি রাধা নিজেও স্বীয় রূপ বর্ণনা করেছেন। ভারখণ্ডের অন্তর্গত ছত্রখণ্ডে কৃষ্ণের রাধার প্রতি একটি উক্তি এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়।

''হাস কুমুদ তোর দশন কেশর।
ফুটিল বন্ধুলী ফুল বেকত আধার।।
বাহু তোর মৃণাল কর রাতা উতপল।
অপুরুব কুচ চক্রবাক যুগল।।

ঈষৎ ফুটিত পদ্ম তোর নাভি থানে।

কনকরচিত তোর ত্রিবলী সোপানে।।" [১২]

(পৃ: ২৯৭, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বড়ু চণ্ডীদাস, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, দেজ, ১৯৯৯)

আহমদ শরীফ 'লায়লী মজনু' কাব্যের সম্পাদকীয় ভূমিকায় এই কাব্যকে ছয়টি যুগ-দুর্লভ গুণে অনন্য বলে দাবী করেছেন। গুণগুলি হল — লায়লী মজনু যথার্থ ট্রাজেডি, কাব্যকাহিনী অলৌকিকতামুক্ত বাস্তবজীবনভিত্তিক, কাব্যরস অশ্লীলতামুক্ত, মানবিক প্রেমোপাখ্যান, স্বাধীন অনুবাদ তথা মৌলিক রচনা এবং ঋতু-পর্যায়ের গীতিনাট্যিক রূপায়ণ।[১৩]

(আহমদ শরীফ সম্পাদিত, লায়লী মজনু, পৃ-৪১-৪৫, নভেম্বর, ২০০৬)

আহমদ শরীফ এই কাব্যটির 'কাব্যরস অশ্লীলতামুক্ত' বলে অভিহিত করেছেন। কাব্যটি সম্পর্কে তাঁর এই মতামত কতটা যুক্তিসঙ্গত তা একটু অনুধাবন করা যেতে পারে। লায়লীর রূপবর্ণনা অংশে আমরা দেখতে পাই —

''কুচযুগ মনোরম নবীন শ্রীফল সম

কিবা নব নারাঙ্গ যুগল।।

মধ্যদেশ ক্ষীণ অতি জিনিয়া মৃগের পতি

কনক কিঙ্গিনী শোভাকর।

নাভিপদ্ম বিকশিত অতিশয় উজ্জ্বলিত

লোমলতা অধিক সুন্দর।।"[১৪]

(পৃ : ৯৫, প্রাগুক্ত)

এছাড়াও কাব্যের ‘হেতুবতী লায়লী সংবাদ’ অংশেও দেখতে পাওয়া যায় —

‘‘বালেম-সুবদনী দোহঁ মিলি নিরজনি

খেলত রঙ্গে ধামাল।।

এহ দূতী মণ্ডল কো নহি জানল

বিষম কাম হলাহল।

গোধর হরিহর অন্তর জরজর

কো নহি তিতল জ্বাল।।

নাগর অতি নব তুরিতে মিলাওব

কেলি করাওব তছু সঙ্গে।

কি করব মারুত চঞ্চল পরভৃত

কি করব কঞ্চক অনঙ্গে।।’’[১৫]

(পৃ: ১৪৬, প্রাগুক্ত)

কাব্যের এই অংশে ভোগলিপ্সার বিবরণ থাকার দরুণ আহমদ শরীফ এটিকে ‘কামোদ্দীপক বটিকা’ বলেছেন।[১৬] আবার একই সঙ্গে বলা যায় যে এই কাব্যটির এই অংশ ব্যতিরেকে কামোদ্দীপনার এইরকম উচ্ছ্বল বর্ণনা অন্য কোথাও নেই। এখন প্রশ্ন হল অশ্লীলতা ও আদিরসাত্মক বর্ণনা - এই দুটি কি একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ? কাব্যের প্রয়োজনে নায়িকার রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে প্রায় কমবেশি সকল কবিই আদিরসাত্মক উপমা ব্যবহার করেছেন।

ষোড়শ শতকের শেষার্ধের কবি শেখ চান্দের কাব্য থেকে আমিনার রূপবর্ণনার প্রাসঙ্গিক উদাহরণটি তুলে ধরা হলো।

‘‘অঞ্জন রঞ্জিত হৈল নয়নের কোলে।

পদ পরে ভোমরায় মধুলোভে ভোলে।।

নাসিকা শোভয় জেন এক তিল ফুল।

বেশর শোভয় তাতে মুকুতা - হিল্লোল।।

গৃধিনী পক্ষিণী জিনি শ্রবণ শোভিত।

মণিময় কুণ্ডল আছে তাতে বিরাজিত।।

সুন্দর তিলকের চন্দনের বিন্দু।

সূর্য আচ্ছাদিয়া জেন রহিয়াছে ইন্দু।।

চাঁচর চিকুর দেখি চামরী লজ্জিত।

তাতে বেণী শোভা করে ভুজঙ্গ সহিত।।

রক্তবর্ণ অধর জিনিয়া বিম্ব ফল।

মুকুতার হার জিনি দশন বিমল।।

বক্ষমূলে নবরঙ্গ দেখিতে শোভিত।

যার গন্ধে দশ দিক করে আমোদিত।।

.....

মৃগরাজ - মধ্য জিনি কটি অতি ক্ষীণি।

ঊরুযুগ সুললিত রামরম্ভা জিনি।।"[১৭]

(আহমদ শরীফ সম্পাদিত মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ, পৃষ্ঠা - ৭৫)

ষোড়শ শতকের মুসলিম কবি শেখ কবীরের রচনাও এপ্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। আলোচনার পূর্বে উল্লেখ করে রাখা আবশ্যক যে বাংলা সাহিত্যে 'কবীর'নামে একাধিক কবি ছিলেন। যেমন শেখ কবীর, কবীর, মুহম্মদ কবীর। কবি মুহম্মদ কবীর 'মধুমালতী' কাব্য রচনা করে সুপরিচিত হয়েছিলেন। ডক্টর আহমদ শরীফ শেখ কবীর ও কবীরকে অভিন্ন ব্যক্তি বলে অনুমান করেছিলেন।[১৮]

(ডক্টর আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য ২য় খণ্ড, ১ম সং, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ: ২৯০)

শেখ কবীর বা কবীর সুলতান নসরত শাহের (১৫১৯-৩২ খ্রীঃ) সময়ের কবি ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর পদের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয়।

''শেখ কবীরে ভণে অহি গুণ পামরে জানে

সুলতান নাসির সাহা ভলিছে কমল বনে।"[১৯]

(পৃ-৩৩, আহমদ শরীফ সম্পাদিত মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ)

মূল প্রসঙ্গে পুনরায় আলোকপাত করা যেতে পারে যে ষোড়শ শতকের অন্যতম

কবি শেখ কবীরের পদে নারী-রূপ কীভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাধার রূপবর্ণনায় কবিকে বলতে শোনা যায়,

''অকি অপরূপ রূপের রমণী ধনি ধনি

চলিতে পেখল গজ-রাজ-গমনি ধনি ধনি।

কাজলে রঞ্জিত ধনি ধবল নয়ন ভালে

ভোমরা ভুলল বিমল কমল দলে।।

গুমান না কর ধনি ক্ষীণ অতি মাঝাখানি

কুচ গিরি ফলের ভরে ভাঙ্গি পড়িব যৌবনি।

সুন্দরী চান্দ মুখে বচন বোলসি হাসি

অমিয় বরিখে যৈসে শারদ পূর্ণিমা শশী।।''[২০]

(পৃ: ৩৩, আহমদ শরীফ সম্পাদিত মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ)

অন্যদিকে 'মনোহর-মধুমালতি' প্রণয় উপাখ্যান লিখে ষোড়শ শতকে বিখ্যাত হয়েছিলেন কবি মুহম্মদ কবীর যার নাম একাধিক কবি 'কবীর' বিতর্ক প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'মনোহর-মধুমালতী' কাব্যের আখ্যান নিয়ে আরো কয়েকজন কবি কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁরা হলেন সৈয়দ হামজা, শাকির মাহমুদ। উনিশ শতকেও এই বিষয় কাব্য রচনা করেন নূর মহম্মদ, জোবেদ আলী, কবি চুহর প্রমুখ।

ডক্টর এনামুল হকের মতে 'মনোহর মধুমালতী' কাব্যটি 'গোলে-বকাওলী জাতীয়।'

মনে করা হয় এই কাব্যের মূলকাহিনিটি হিন্দী ভাষায় রচিত ছিল। কোনো ভারতীয় মুসলমান কবি মূল হিন্দী থেকে গল্পটিকে ফারসী ভাষায় কাব্যিক রূপ দিয়েছিলেন। আবার হয়তো এই ফারসী কাব্য থেকেই মুহম্মদ কবীর গল্পের কাহিনীটি সংগ্রহ করেছিলেন।

এই কাব্যের মনোহর-মধুমালতীর পরিচয় ও প্রণয়-অংশ অবলম্বনে আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। ষোড়শ শতকে রচিত এই কাব্যটিতেই দেখা যায় মধুমালতীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি মুহম্মদ কবীর সমসাময়িক কাব্যগুলির ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হননি।

‘‘বিচিত্র কাঞ্চুলি শোভে গাএর উপর।

কেবল রাতুল অতি শীতল পয়োধর।।

কাঞ্চন কটোরা কুচ অধিক সুচারু।

কাঞ্চন পটের পরে হিঙ্গুলানি মেরু।।

কোমলতা বাহু জুড়ি আছে তার পরে।

আঙ্গুলে অঙ্গুরী করে কঙ্কণ শোভা করে।।

ক্ষীণ মাঝা মুষ্টে পুরে হেলে দোলে বাএ।

বিচিত্র হেমরি শাড়ী কাচি আছে তাএ।।

নূপুরের রুনুঝুনু পদযুগে চারু।

কামাসন হৈমস্তম্ভ যেন দুই উরু।।

যৌবন মাতলি কন্যা হেলি হেলি পড়ে।

সুরঙ্গ অঙ্গে জড়ি পার ঝরি গড়ে।।”[২১]

(পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৫২, আহমদ শরীফ সম্পাদিত মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ)

ষোড়শ শতকে রচিত একের পর এক কাব্যমধ্যে নারীর রূপবর্ণনায় প্রায় একই ধরণের উপমা ব্যবহার পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। উল্লিখিত সব কয়টি কাব্যই রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান। প্রত্যেকটি কাব্যই কাহিনি বিন্যাসে একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন হলেও এই একস্থানে এসে কোথাও যেন একই পথ অনুসরণ করছে। আদিরসাত্মক উপমার অকপট ব্যবহার কাব্যের ঘটনা বিন্যাসের সঙ্গে হয়ে উঠেছে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কখনোই তা হয়ে ওঠেনি অশ্লীল বা অপ্রাসঙ্গিক। সাহিত্যে কোন্‌টা শ্লীল, কোনটা অশ্লীল — এই বিষয়টি অত্যন্ত আপেক্ষিক এবং তা সম্পূর্ণরূপে যুগ, কাল অনুযায়ী পরিবর্তনশীল ও প্রশ্নসাপেক্ষ। সংস্কৃত আলংকারিকদের মধ্যেও এ বিষয়ে তুমুল বিতর্ক ছিল। এই বিতর্কে প্রবেশ করার আগে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের কবি সাবিরিদ খানের লেখা ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্যের বিদ্যার রূপবর্ণনার অংশটি একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে।

‘‘মুখ-বিধু পূর্ণ ইন্দু কিয়ে অরবিন্দ।

মৃগবংশ-নেত্র কিবা লীলামত্ত ভৃঙ্গ।।

বালে জিনিয়া ভাল শ্রীমন্ত উজ্জ্বল।

বান্ধুলি প্রসূন নিন্দি অধর সুগোল।।

রদ পাঁতি মুতি জুতি বাচ সুমধুর।

ভুরুভঙ্গে কামশর নিঃসরে প্রচুর।।।

কণ্ঠরেখা ত্রসি কম্বু জলধি মজ্জিল।

কমল-কলিকা-কুচ হৃদয়ে উগিল।।

কৈছন অঙ্গের লীলা কৈআর স্বরূপ।

কৈছন নাসিকাশ্রুতি কর ভুজযুগ।

কৈছন কুমারী মধ্যভাগ পাদশ্ছন্দ।

কৈছন নিতম্ব উরূ জঙ্ঘের প্রবন্ধ।।"[২২]

(পৃ: ৩৯, বিদ্যাসুন্দর, শাহ্ বারিদ খান, আহমদ শরীফ সম্পাদিত মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ)

ষোড়শ শতকের বিভিন্ন মুসলিম কবির কাব্যেই আমরা নারীর রূপ বর্ণনার প্রায় একই ধরনের আঙ্গিক বিন্যস্ত হতে লক্ষ করলাম। নারী শরীরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদানে বলা চলে সেই সময়ের কোনো কবিই বিস্মৃত হননি। তাঁদের অনায়সলব্ধ শব্দ বন্ধ ব্যবহারের প্রয়োগ ভঙ্গিমাতেও যথেষ্ট সাবলীলতা ছিল। এথেকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে

যে যুগধর্ম অনুযায়ী তা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'কাব্যে অশ্লীলতা-আলংকারিক মত' প্রবন্ধে কাব্যে অশ্লীলতা প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করেছেন।[২৩] সংস্কৃত আলংকারিক বামনের মতে, যে কথা শুনলে মনে লজ্জা, ঘৃণা বা অমঙ্গলের আশঙ্কা উদয় হয়, সেই বাক্যই অশ্লীল। 'ব্রীড়াজুগুপ্সামঙ্গলাতঙ্কদায়ী' বাক্যই তাঁর মতে অশ্লীল। এই যুক্তি অনুসারেও আমাদের আলোচ্য কাব্যগুলি অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট নয় এবং ষোড়শ শতকের মূল আলোচ্য কাব্য দৌলত উজীর বাহরম খানের লেখা 'লায়লী মজনু' কাব্যকে আহমদ শরীফ যে এর 'কাব্যরস অশ্লীলতা মুক্ত' বলে অভিহিত করেছিলেন তার সত্যতা সম্পর্কেও আর কোনো সংশয় থাকে না। তাঁর মতে, এটি 'আদিরসাত্মক কাব্য' কিন্তু এর 'কাব্যরস অশ্লীলতামুক্ত' এই বিবৃতি নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে।

আমরা এতক্ষণ ষোড়শ শতকের মুসলিম কবিরা তাঁদের কাব্যের মূল নায়িকাদের কীভাবে কাব্যমধ্যে নির্মাণ করতে চেয়েছেন তা পর্যবেক্ষণ করলাম। বিদ্যা, লায়লী, আমিনা, সয়ফুলমুলুক, মধুমালতী প্রমুখ সকল নারী চরিত্ররাই কখনো কবির বয়ানে আবার কখনো বা কাব্যে উপস্থিত নায়কের বা পুরুষ চরিত্রের বয়ানে রক্ত মাংসের জীব হিসেবে পরিবেশিত হয়েছে।

অন্যদিকে ষোড়শ শতকের মুসলিম কবিদের লেখা কাব্যে নারী চরিত্রের কণ্ঠস্বর কতোটা শ্রুত হয়েছে তাও ভেবে দেখবার বিষয়। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী মেয়েদের নিজস্ব বক্তব্য পেশ করবার পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের নীরবতাকেই অধিক গুরত্ব দেওয়া হয়।

সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির মূল অভ্যন্তরে উপনীত হলে মেয়েদের কণ্ঠস্বর অশ্রুত থেকে ক্রমাগত অশ্রুততর হতে দেখা যায়। রাশিয়ান একটি গল্পে ছিল, একটা সিংহ বলছে, আমরাও যদি গল্প লিখতে পারতাম, তাহলে দিনের পর দিন শিকারীর হাতে আমাদের পরাজয় ঘটতো না। আমরাও যুদ্ধ জিততাম আর আমাদের জয়জয়কারও বীরত্বের সঙ্গে প্রচারিত হতো।

সমাজের মূলস্রোতে পুরুষের সংখ্যাধিক্য ও মেয়েদের প্রান্তিকতার কারণই কী নারীর কণ্ঠস্বর অশ্রুত থেকে যাওয়ার পেছনে কার্যকরী নয়? পুরোনো প্রসঙ্গ টেনে আরও একবার কি প্রশ্ন উঠে আসে না যে ষোড়শ শতকের মুসলিম নারীদের লেখা কোনো কাব্য যদি কোনোভাবে সংগ্রহ করা যেতো, তাহলে সেখানে পুরুষের রূপ বর্ণনার প্রাচুর্য লক্ষ করা যেত? ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যের অবরোধবাসিনীদের নিজস্ব ইতিহাস কেন বা কিভাবে হারিয়ে গেল এই প্রশ্নও একইসঙ্গে উঠে আসে।

''কিছুই মীমাংসা নয়, কোনোখানে নেই কোনো শেষ
হাতে তুলে নিয়েছ যে ফল
নিমেষে তা ঝরে যায় বাতাসবিহীন অন্ধ ঘরে।''[২৪]

(মীমাংসা — শঙ্খ ঘোষ)

মেয়েদের নীরবতার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে যথার্থ সমাধানসূত্র হয়তো কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। সুকুমারী ভট্টাচার্যের লেখা 'নারী ও নীরবতা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে জানতে পারা যায়, ঋগ্বেদে (আনুমানিক রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ থেকে১০০০ এর

মধ্যে) অম্ভৃণ ঋষির কণ্যা বাক্ (অর্থাৎ বাণী) বেদান্ত দর্শনের যে মূল ভিত্তিভূমি 'সোহম্' অর্থাৎ 'আমিই সেই' — উচ্চারণ করেছিলেন।[২৫] (ঋগ্বেদ - ১০/১২৫)

তাহলে দেখতে পাওয়া যায় ঋগ্বেদের সময়ে মেয়েরা সরব ছিলেন। এমনকি সে সময়ের বেশ কয়েকজন মহিলা কবির নামও জানতে পারা যায়। যেমন - লোপামুদ্রা, অপালা, শাশ্বতী, ঘোষা প্রমুখ। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের যুগে (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে পঞ্চম শতক) এসে কোনো বিখ্যাত নারী কবির নাম শুনতে পাওয়া যায় না। উপনিষদেও মৈত্রেয়ীকে অধিকাংশ সময়ে স্বামীর অধ্যাত্ম উপদেশ নীরবে শুনতে দেখা যায়। নাট্যসাহিত্যের নারী চরিত্রদেরও এমনকি কম কথা বলতে শোনা যায়। উক্ত প্রবন্ধে লেখিকাকে বলতে শোনা যায়, ''কেন আমরা কোন আরিস্তোফানেসকে পেলাম না, যিনি মেয়েদের অসহযোগের ছবি আঁকতে পারেন, তা সে ঠাট্টা-মস্করার ছলে হলেও ?''[২৬]

(পৃ: ১৩৩, সুকুমারী ভট্টাচার্য - প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, এন বি এ, নভেম্বর, ২০০৬)

পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে মেয়েদের নীরবতার একটা যুগানুক্রমিক ইতিহাস আছে কিম্বা এটাও হতে পারে যে মেয়েদের স্বরকে (Voice) সুকৌশলেও সুনিপুণভাবে ইতিহাস থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান অধ্যায় যেহেতু ষোড়শ শতকের কালসীমার মধ্যেই নিবদ্ধ সেহেতু আরও একটা কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে আমরা এ পর্যন্ত শুধুমাত্র এই সময়ের

পুরুষ লেখকদের কথাই বলছি। তাহলে কি উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে ষোড়শ শতকের কোনো মুসলিম মহিলা কবি কলম ধরেন নি?

আমাদের পরবর্তী অনুসন্ধানের বিষয় ষোড়শ শতকের মুসলিম কবিদের কাব্যে মহিলাদের কণ্ঠস্বর কতোটা এবং কী প্রকারে শোনা গেছে।

ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে রাগানুগা বৈষ্ণব ভক্তিবাদ বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণে প্রবেশ করেছিল। অনেক মুসলিম কবির কাব্যও এই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ''বিশেষতঃ ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্যপ্রভাবিত রাগানুগা-বৈষ্ণব ভক্তিবাদের প্লাবনে 'নদে - শান্তিপুর' তো ভেসে গিয়েছিলই, এমন কি বাংলার চতুঃসীমা ও প্রান্তীয় অঞ্চলেও এই সর্বগ্রাসী আবেগধর্মের প্রবল স্রোতোধারা প্রবেশ করেছিল।''[২৭]

(পৃ: ২০৫, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত)

শ্রী চৈতন্যের প্রভাবজাত হয়েই সে কারণে ষোড়শ শতকের অনেক মুসলিম কবির রচনায় বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীরাধিকার আকুতি শুনতে পাওয়া যায়। এই শতকের অন্যতম কবি চাঁদ কাজী রচিত বংশী ধ্বনি পদে দেখতে পাই —

''বাঁশী বাজান জান না

অসময়ে বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না।

যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনের কাছে

তুমি নাম ধৈরা বাজাও বাঁশী

আমি মরি লাজে।

ওপার হইতে বাজাও বাঁশী

এপার হইতে শুনি।

অভাগিয়া নারী হাম হে

সাঁতার নাহি জানি।

যে জড়ের বাঁশের বাঁশী

সে জড়ের লাগি পাওঁ,

জলে মূলে উপাড়িয়া

নদীতে ভাসাওঁ।”[২৮]

(পৃ: ৩৩, আহমদ শরীফ সম্পাদিত

মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ)

এই পদের মধ্য দিয়ে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে একটি নারীর বয়ানে নির্মিত পদে সে নিজেকে ‘অভাগিয়া নারী’ বলে উল্লেখ করছে। এমনকি লজ্জাশীলতাকে যে রমণীর অন্যতম গুণের মধ্যে ধরা হয় তাও এই ‘বংশীধ্বনি’ পদে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে — ‘যখন আমি বৈসা

থাকি গুরুজনের কাছে। / তুমি নাম ধৈরা বাজাও বাঁশী। / আমি মরি লাজে।' তদানীন্তন কালের একজন মেয়ের আত্মকথনে যেন চিরাচরিত নারীর লজ্জা, কুণ্ঠা বা দ্বিধার ছবিই ধরা পড়ে।

ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের কবি সাবিরিদ খানের লেখা তিনটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলি হলো —

১। বিদ্যাসুন্দর

২। রসূল বিজয় ও

৩। হানিফা ও কয়রা পরী।

'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের কাহিনী মূলত সংস্কৃত সাহিত্য থেকেই নেওয়া একটি আদিরসাত্মক প্রেমের অন্যতম নিদর্শন। এই কবিকে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের আদি রচয়িতা হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর হানিফা ও কয়রা পরী কাব্যে ফারসী সাহিত্যের হজরত আলীর পুত্র মোহাম্মদ হানিফার বীরত্বপূর্ণ কাহিনী স্থান পেয়েছে। এই কাব্যটি আমাদের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এখানে দেখা যায় সাহিরাম রাজার কন্যা বীর্যবতী জৈগুণকে যুদ্ধে পরাজিত করে মোহাম্মদ হানিফা। অন্যদিকে কয়রাপরী হানিফার প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে অপহরণ করে। কয়রাপরী পরী হলেও সে একজন নারীচরিত্রেরই প্রতিনিধি স্বরূপ। তাই ষোড়শ শতকের প্রেক্ষিতে একজন নারীর প্রেমে পড়ে আরেকজন পুরুষকে অপহরণ করা সেই হিসেবে বিরল দৃষ্টান্ত। এমনকি কয়রাপরী অকপটে স্বীকারও করে যে তার হানিফার প্রতি আসক্তি

এতটাই প্রবল যে 'দিনে একবার মুখ না দেখিলে মরে।'[২৯] (পৃ: ৩৫, আজহার ইসলাম-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি) এই কাব্যের অপর আর একটি নারী চরিত্র সাহিরাম রাজার কন্যা জৈগুণকেও দেখা যায় সৈন্য পরিচালনা করে রোকাম শহরে যেতে। জৈগুণ ঐ শহরে গিয়ে সেখানকার দুর্মিক রাজাকে পরাজিত করে এবং তাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতেও দেখা যায়। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করে রাখা ভালো যে রাজকন্যা জৈগুণ কিন্তু কোনো পরী চরিত্র নয়। তাহলে একথা বলা যেতেই পারে যে 'হানিফা ও কয়রাপরী' কাব্যে সাবিরিদ খাঁ যে দুজন নারী চরিত্রের নির্মাণ করেছেন সেই দুজনই দুরকমভাবে আপন আপন ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল। একজন নারীর কাছে যুদ্ধে একজন পুরুষ রাজার পরাজয়ের ঘটনা ষোড়শ শতকের নিরিখে যথেষ্ট আধুনিকতার পরিচয় বহন করে। পুরুষের তুলনায় হীন ও দুর্বল প্রমাণ করে গৌরবে মহিমান্বিত হবার পরিবর্তে এই কাব্যে নারী হয়ে ওঠে আত্মশক্তিতে বলীয়ান।

আবার সাবিরিদ খানের লেখা মেহের নাগারের বারমাসীতে নারীর কণ্ঠস্বর অন্য খাতে ধ্বনিত হতে শোনা যায়। অধ্যায়ের শিরোনামেই বোঝা যাচ্ছে যে এটি একজন নারীর বারমাস্যা। মঙ্গলকাব্যে আমরা বারমাস্যার উপস্থিতি অনেকক্ষেত্রেই লক্ষ করে থাকি। চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরার বারমাস্যাতে আমরা দেখতে পাই কল্পিত আশঙ্কায় কালকেতুর উপর তার নিঃসপত্ন অধিকার অবিচল রাখার উদ্দেশ্যে ফুল্লরা বলে উঠেছে,

''কি কহিব দুঃখ মোর কহনে না যায়।

কাহারে বলিব কি দূষিব বাপ মায়।।

শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী।

সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি।।

.....

বৃথা বনিতা-জনম বৃথা বনিতা-জনম।

ধূলি ভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন।।

দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।

জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।।"[৩০]

(পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩৮-২৩৯, কবিকঙ্কন

- চণ্ডী-মুকুন্দ চক্রবর্তী)

বাংলা সাহিত্যে বারমাস্যার ব্যবহার অনেক মঙ্গলকাব্যে উপস্থিত থাকলেও এর উদ্ভব হয়েছে আমাদের লোককাব্য থেকে।

"The Baramasi originated in folk-poetry; that owing to its intrinsic found attractiveness and its great popularity in Bengal, it found a place again and again in the classifical literature, being, of course always reshaped and remoulded by various poets according to their poetic aims, imagination and creative ability."[৩১]

(পৃষ্ঠা ১১০, বাংলা মঙ্গলকাব্যে

লোকসাংস্কৃতিক পরিবেশ-বরুণ

কুমার চক্রবর্তী)

শাহ্ বারিদ খান রচিত 'মেহের নাগারের বারমাসী'তে আমরা মেহেরকে বলতে শুনি,

''ভাদ্রমাসে ভর্তা বিনু শর্বরী বিষম।

ভিমভেরু মন্দিরেতে ভৈরব গর্জন।।

ভবসুখ খঞ্জন রতিক্রিয়াএ সানন্দ।

ভিমভেরু মন্দিরে করুণা অনুবন্দ।।

ভাগ্যবতী ভর্তা করে সুখ অবিচার।

ভাব সার ভাবিনী বিল্ললে অনিবার।।''[৩২]

(পৃ: ৪৩, মধ্য যুগের কাব্য-সংগ্রহ)

পতির জন্য বিরহিনী মেহের নিজেকে এর পরবর্তী অংশে 'অবলা সৌভাগ্যহীন' বলেও অভিহিত করেছে। স্বামীর সুখ ভিন্ন তার জীবন যে ব্যর্থ হয়ে উঠেছিল তা বোঝা যায় যখন সে বলে ওঠে,

''তুমি বিনে অকারণ জীবন-যৌবন।

তুমি বিনে অকারণ এ তিন ভুবন।।''[৩৩]

(পৃ: ৪৬, তদেব)

শাহ বারিদ খান তাঁর 'হানিফা ও কয়রাপরী' কাব্যে জৈগুণ ও কয়রাপরীকে যেভাবে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দান করেছিলেন সেই বলিষ্ঠতা মেহের চরিত্রে এসে যেন নারীর চিরায়ত ধর্ম কমনীয়তায় পরিণত হয়েছে। চণ্ডীদাসের রাধা যেমন বলে ওঠেন,

''একে কুলবতী ধনি তাহে সে অবলা।

ঠৈকিল বিষম প্রেম কত সবে জ্বালা।।''[৩৪]

(পৃষ্ঠা ৩৯, বৈষ্ণব পদাবলী, চয়ন)

এই সমস্বর যেন মেহেরের জবানীতেও ধরা পড়ে।

অধুনা-প্রয়াত একাধারে কবি, সাহিত্যিক, মানবাধিকার কর্মী মায়া অ্যাঞ্জেলা লিখেছিলেন। আফ্রো-আমেরিকান এই সাহিত্যিক তাঁর প্রথম আত্মজীবনী 'I Know Why the Caged Bird Sings' বইটিতেও বারবার মেয়েদের প্রতিনিয়ত হারিয়ে যাওয়া অশ্রুত কণ্ঠস্বরের কথা বলেন। যা যথাযথভাবে শুনতে পেলে এবং সেই শুনতে পাওয়া স্বরকে সুসংবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করা গেলে, আমরা আজ হয়তো অন্য কোনো ইতিহাসের সন্ধান পেতাম।[৩৫] (প্রসঙ্গসূত্র : Maya Angelou - I know why the Caged Bird Sings - Edited by Harold Bloom, Viva Books Private Limited, 2007, Indian Edition)

ষোড়শ শতকের একজন স্বল্পখ্যাত কবি ফতেহ্ খানের 'বিরহ বেদনা' নামক পদেও আমরা নায়িকার আত্মকথনে নায়কের জন্য বিলাপ ভিন্ন আর কিছু শুনতে পাই না।

''প্রাণ সই কি কহব হাম হতভাগী

দুঃসহ মদন শরে দহে মোরে নিরন্তরে

উঠি বসি নিশি রহোঁ জাগি।

বসন্ত খরিএ গেল পাউকের ঋত ভেল

এবেহ না আইসে পিউ মেরা।

.....

কি এ বিধি ভেল বাম পিয়া গেল দূর ধাম

তনু সে যৌবন গেল ভারা।

যদি সে না মিলে পিউ অনলে তেজিমু জীউ

পিউ বিনে সব আন্ধিয়ারা।”[৩৬]

(পৃষ্ঠা-৭৪, আহমদ শরীফ সম্পাদিত

মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ)

কিম্বা ঐ শতকেরই আরেকজন কবি আফজলের ‘বিরহিনীর খেদ’ অংশে দেখতে পাই কামজ্বরে জর্জরিত এক বিরহিনী নারীর আকুলতার চিত্র। বসন্তকাল সমাগত। প্রিয় অদর্শনে সে রীতিমত ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। তাই কবিতাটিতে শুনতে পাওয়া যায় —

‘‘সব ঋতু সঙ্গে আইল রসভঙ্গ সহিত

বিরহিনী ক্ষীণ তনু মদনে চিন্তিত।

আইল বসন্ত ঋতু লইয়া নব শর

মনোজ সারথি লইয়া সঙ্গে,

তরু সব হরষিত সতত যে পুলকিত

দশ দিক শোভে নানা রঙ্গে।

ফির এ কন্দর্পবর হাতে লইয়া ধনুশর

সমীর তুরঙ্গে সেয়ার,

নানা তরুলতা ফুলে শিরীষ চামর দোলে

ষটপদ যন্ত্রের ঝঙ্কার

কহে আফজল হিতে বরিখ মাধবী ঋত

নিবারিতে কাম দুঃশাসন।”[৩৭]

(পৃষ্ঠা - ৭৬, তদেব)

অন্যদিকে দৌলত উজির বাহরাম খান বিরচিত ‘লায়লী মজনু’ কাব্যেও আমরা মজনুর জন্য লায়লীর বিরহ বিলাপ শুনতে পাই। পাঠশালায় লায়লী মজনুর অবাধ মেলামেশা ও প্রণয় সম্পর্কের কথা লায়লীর সখীদের মারফৎ তার মায়ের কানে এসে পৌঁছায়। আর তখন থেকেই লায়লীর ঘরের বাইরে বেরোনোয় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। মজনুর বিচ্ছেদে বিরহ বেদনা প্রবল হয়ে ওঠে তার। কাব্যের এই অংশে দেখতে পাওয়া যায় একজন বিরহিনী নারীর শোক-জর্জরিত কণ্ঠস্বর —

‘‘সহিতে দুঃসহ দুঃখ প্রেমের বেদন।

কহিতে দারুণ দোষ পিরীতি কথন।।

রাবণের চিতা সম জীবন দহএ।

শ্রাবণের ধারা জিনি নয়ান বহএ।।

.....

অধিক দারুণ দোষ বিধি হৈল বাম।

অধম পাপিনী মোর না পুরিল কাম।।

অনাথ করিয়া মোরে ছাড়ি গেল কান্ত।

মনের আনল মোর জলে নহে শান্ত।।

বল বুদ্ধি হিত শুদ্ধি সকল হারাইলুঁ।

বিরহ বিয়োগ সঙ্গে বিরলে রহিলুঁ।।

এই মতে বিরহিণী দুঃখিনী সদাএ।

বঞ্চএ মৃতের প্রায় হৈয়া সর্বথাএ।।"[৩৮]

(পৃষ্ঠা-১০৫, দৌলত উজির বাহরাম খাঁ, লায়লী মজনু, আহমদ শরীফ সম্পাদিত)

কাব্যের এই অংশে মজনুর জন্য লায়লীর বিরহ বেদনা চরম পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। দৌলত উজির বাহরাম খাঁ প্রথানুগ পথ অনুসরণ করেই নায়িকার বিরহ-সন্তাপিত হৃদয়কে সুললিতভাবে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক তাঁর কাব্যে লক্ষ করবার মতো যে তিনি 'লায়লীর বিরহ-বিলাপ' অংশের ঠিক পরেই 'মজনুর বিরহ-বিলাপ' কেও কাব্যে স্থান করে দিয়েছেন। বিচ্ছেদের কারণবশতঃ নায়িকার বিলাপের সঙ্গে সমান্তরালভাবে

প্রায় একই ভাষা কৌশলে নায়কের বিরহজনিত শোক উপস্থাপন করা সত্যিই খুব উল্লেখযোগ্য। লায়লীর জন্য শোকাতুর মজনু যখন তার ব্যথিত হৃদয়ের যন্ত্রণা প্রকাশ করে তখন আধুনিক পাঠকের কাছে কোথাও যেন নারী-পুরুষের আবেগের সমমর্যাদার বার্তা এসে পৌঁছায়। এই অংশে মজনুকে বলতে শোনা যায় —

''কন্যার সহিত পুনি না হএ মিলন।।

হৃদয় দুঃখিত অতি তাপিত বহুল।

সরোরুহ বিনে যেন ভ্রমর আকুল।।

মনের আনল তাপে শরীর দহিল।

.....

মুঞি কর্মহীন অতি জনম তাপিত।।

দেখা দিয়া প্রাণ ধন হইলা আদেখ।

স্বপন দেখিলুঁ মুঞি কিবা পরতেক।

অশেষ পুণ্যের ফলে তোহ্মাকে পাইলুঁ।

বিশেষ কর্মের দোষে পুনি হারাইলুঁ।।

.....

প্রাণের ঈশ্বরী বিনে তেজিব পরাণ।

মৃতবৎ কায়া মোর কিবা লাজ-মান।।

মাতা পিতা ইষ্টগণে নাহি মোর কাজ।

অকারণে সব সুখ সম্পদ বিরাজ।।"[৩৯]

(পৃষ্ঠা-১০৬, ১০৭, দৌলত উজির

বাহরাম খাঁ - লায়লী মজনু, আহমদ

শরীফ সম্পাদিত)

কাব্য মধ্যে কেবলমাত্র একবার নয়, বহুবারই মজনুকে লায়লীর জন্য বিলাপ করতে শোনা যায়। এই কাব্যের প্রধান নারী চরিত্র লায়লী যদিও বলে ওঠে,''মুঞি অভাগিনী জনম দুঃখিনী। বিফল রাখি জীবন।।"[৪০] (পৃ: ১২৩), কাব্যের শেষ পর্যায়ে দেখা যায় লায়লির শোকে মজনুও স্বেচ্ছামৃত্যুকেই নির্বাচন করে বলে, ''লায়লীর নাম ধরি হাহাকার শব্দ করি। ততক্ষণে তেজিলা জীবন।।"[৪১] (পৃ: ২২৩, প্রাগুক্ত)

এছাড়া ষোড়শ শতকের কাব্যগুলিতে নারীকে সামাজিক কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচানোর নানাবিধ কৌশল লক্ষ করবার মতো। মুহম্মদ কবীর রচিত 'মনোহর মধুমালতী' কাব্যে দেখা যায়, জটবহর রাজার কন্যাকে এক দৈত্য অপহরণ করে। মনোহর, দৈত্যকে যুদ্ধে পরাজিত করে রাজার কন্যা পায়মাকে তার বাবার কাছে পৌঁছে দেন। সেখানে মনোহর মধুমালতীকে দেখতে পায় ও তার প্রতি গভীর প্রণয়ে আসক্ত হয়। কিন্তু দেখতে পাওয়া যায়, মধুমালতীর মা কলঙ্কের আশঙ্কায় ভীত হয়ে মেয়েকে মন্ত্রবলে শুকপাখিতে পরিণত করে। এথেকে বুঝতে পারা যায় যে তখনকার পরিবার কাঠামোতেও নারীর সম্ভ্রম রক্ষার্থে

পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যথেষ্ট চিন্তিত ছিল। তারা তাদের সাধ্যমতো ব্যবস্থা নিতে পিছপা হতো না। আবার ঐ একই কাব্যে দেখা যায় মধুমালতী মনোহরের জন্য কলঙ্ক উপেক্ষা করে তারই প্রতি আসক্ত হয়েছে। সমাজ-ধর্ম-নীতি কোন কিছুকে তোয়াক্কা না করে সবার উপরে প্রেমকেই স্থান দিয়েছে। প্রথম পরিচয়েই সে মনোহরের কাছে অকপটে নতিস্বীকার করে বলে উঠেছে,

''ধরাইতে না পারি চিত্ত তোহ্মা রূপ হেরি।

ধরফড় করে প্রাণ না দেখিলে মরি।।''[৪২]

(পৃষ্ঠা ২১২, ওয়াকিল আহমদ)

এছাড়া মধুমালতী সখীদের কাছেও স্বীকার করেছে তার মনোভাব —

''স্বর্গ মর্ত্য পাতালে নাহি হেন রূপ।

ইন্দ্র পুরন্দর জিনি অধিক স্বরূপ।।''[৪৩]

(পৃ : ২১২, প্রাগুক্ত)

এথেকে বোধগম্য হয় যে, সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে নারীদের উপর অনেক বিধিনিষেধ থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাদের সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করে রাখা যায়নি। তারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বলীয়ান হয়ে নিজেদের মতেই তাদের জীবন, অনেকক্ষেত্রে যাপন করেছে।

দৌলত উজির বাহরাম খানের লেখা 'লায়লী মজনু' কাব্যেও দেখতে পাওয়া যায় যে পরিবারের কলঙ্কের ভয়ে লায়লীর মা লায়লীকে বাড়ীর মধ্যে অন্তরীণ করে রাখেন। লায়লীকে

বাক্যবাণে জর্জরিত করে তোলেন তার মা। কাব্যমধ্যে তাকে বলতে শোনা যায়,

''... কুলের মহিমা নিজ রাখহ সামাল।।

পুরীর বাহির হৈলে বুঝিবে আপনা।

গৌরব তেজিয়া তোরে করিমু তাড়না।।

ধৈরজ ধরহ মতি প্রাণের নন্দিনী।

নিশি শেষে উদয় হইবে দিনমণি।।"[৪৪]

(পৃ : ১০২, লায়লী মজনু)

কাব্যমধ্যে শুধুমাত্র একবারই নয়, লায়লীর মাতাকে বারবার সরব হতে দেখা যায়। মজনুর সঙ্গে লায়লীর সম্পর্ক ছেদ করবার উদ্দেশ্যে তাকে বলপূর্বক ইবন্‌সালামের পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। লায়লী কোনোভাবেই স্বামীকে যখন গ্রহণ করতে অসম্মত হয়, তখনও তার মাকে দেখা যায় নীতিশিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে। তিনি মেয়েকে বলে ওঠেন,

''কুলের কলঙ্ক পুনি আপনার লাজ।

কদাচিত ভাল নহে হেনমত কাজ।।

সংসারের কর্ম এহি বিবাহ রচন।

সহজে দুহিতাবর না হৈঅ বিমন।।

যদি সে না মান তুম্মি এই হিত বাণী।

দেশভর হইবেক অযশ কাহিনী।।”[৪৫]

(পৃষ্ঠা : ১৩৮, দৌলত উজির

বাহরাম খাঁ - লায়লী মজনু)

এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ষোড়শ শতকের সমাজেও সামাজিক কুলমর্যাদা রক্ষার তাগিদ কোনোমাত্রায় কম ছিল না। বংশকে সামাজিক কলঙ্ক থেকে মুক্ত করবার জন্য অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করছে লায়লীর মা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একজন নারীও কীভাবে ঐ সমাজকাঠামোরই প্রতিনিধি হয়ে ওঠে তা লক্ষ করবার মতো। মা হয়ে মেয়ের আবেগ, অনুভূতি, দুঃখ, কষ্টকে বুঝতে পারাই ছিল লায়লীর মায়ের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, তিনি তা না করে নিজের পরিবারকে কলঙ্কমুক্ত করবার জন্য অধিক যত্নশীল হয়ে উঠেছেন। অন্যদিকে মেয়ের প্রতি বাৎসল্য স্নেহ যে লায়লীর মায়ের প্রবল ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না যখন কাব্যমধ্যে দেখতে পাওয়া যায়,

‘‘শুনিয়া কন্যার কথা জননী আকুল।

চিন্তিত তাপিত অতি মৃত সমতুল।।

বিলাপ করএ মাতা দুঃখিত অন্তর।

ধরণীতে গড়িয়া রোদএ বহুতর।।

পাইলুঁ পুণ্যের ফলে কুমারী রতন।

পালিলুঁ প্রাণের সম করিয়া যতন।।

.....

এই মতে বহু ভাবি করিলা বিলাপ।

অচৈতন্য হৈল মায়ে ভাবিয়া সন্তাপ।।" [৪৬]

(পৃষ্ঠা - ১৪০, প্রাগুক্ত)

এ থেকে সন্তানের প্রতি মাতৃহৃদয়ের চিরন্তন মমতার চিত্রই প্রকাশিত হয়। প্রেমে পড়ে উন্মাদদশাপ্রাপ্ত মজনুর জন্য তার পিতামাতার বিলাপের কথা লিখতেও বিস্মৃত হন না কবি দৌলত উজির বাহরাম খান। কাব্যের এই অংশে দেখতে পাওয়া যায়,

''জননী ব্যথিত আর জনক দুঃখিত।

দেখিয়া আকুল হৈল পুত্রের চরিত।।

চিন্তিত তাপিত অতি বিষাদিত মন।

আকুল বিকুল হৈলা পুত্রের কারণ।।

.....

শুন পুত্র মিনতি বচন পরিহার।

তুহ্মি বিনে জগত হইছে অন্ধকার।।

নয়ান পুতলি তুন্ধি প্রাণের পরাণ।

তুন্ধি বিনে সংসারেত নাহি মোর আন।।”[৪৭]

(পৃ: ১১২, ১১৪, প্রাগুক্ত)

কাব্যে ‘মজনুর জন্য পিতা-মাতার বিলাপ’ অংশেও একজন পুত্রের জন্য তার বাবা-মায়ের উদ্বেগ ও দুঃখ-বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ করবার মতো যে পুত্রসন্তানের জন্য তার পিতামাতার এই বিলাপের মধ্যে কোথাও কোনো সামাজিক বংশমর্যাদা ক্ষুন্ন হবার আশঙ্কা নেই। লায়লীর মায়ের জবানীতে যেখানে বারবার মেয়ের জন্য কুলমর্যাদা কালিমালিপ্ত হবার ভয় থাকে, সেখানে একই পরিস্থিতিতে মজনুর বাবা-মায়ের প্রতিক্রিয়ার ভিন্নস্বরূপ লক্ষ করা যায়। এথেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে যায় যে তখনকার সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের উপর পরিবারের মান-মর্যাদা রক্ষার দায়-দায়িত্ব নেহাত কম ছিল না। সেকারণেই একজন নারীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে পরিবারের অভিভাবক স্থানীয়রা অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকত।

এবার আমরা দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত ‘লায়লী মজনু’ অবলম্বনে কাব্যের প্রধান নারী চরিত্র লায়লী চরিত্রের ক্রমবিকাশ লক্ষ করব। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যোড়শ শতাব্দীর মুসলিম কবিদের কাব্যগুলির বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে হিন্দু কবিদের কাব্যের বিষয়বস্তুর থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। মূলত দেবদেবীর মাহাত্ম্য নির্ভর বিষয়-এর উপরই গুরুত্ব দিয়েছিলেন হিন্দু কবিরা। অন্যদিকে মুসলিম লেখকদের

কাব্যের চরিত্ররা অনেকাংশে যেন বাস্তব সমাজ থেকে উঠে এসেছে। মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর 'মুসলিম বাংলা-সাহিত্য' গ্রন্থে 'মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যই ইহার একমাত্র কারণ' বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, মুসলিম কবিদের লেখা বাংলা সাহিত্যকে মোট ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়।[৪৮] যথা —

১। কাহিনী - কাব্য - এই কাহিনী - কাব্যগুলিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা —

ক) মুসলিম কাহিনী কাব্য :—

অ) ইউসুফ-জলিখা - শাহ মোহাম্মদ সগীর

আ) হানিফা ও কয়রা-পরী - সাবিরিদ খান

ই) সয়ফুল-মুল্‌ফ্‌ - দোনাগাজী

ঈ) লাইলী-মজনু-বাহরাম খান

খ) ভারতীয় কাহিনী-কাব্য :—

অ) মনোহর-মধুমালতী - মুহম্মদ কবীর

আ) বিদ্যাসুন্দর - সাবিরিদ খান

২। ধর্মীয় কাব্য : এই ধর্মীয় কাব্যগুলি তিন ভাগে বিভক্ত : —

ক) শরা-শরিয়ৎ - সম্বলিত কাব্য :—

নসিহৎনামা - আফজল আলী

খ) মুসলিম ঐতিহাসিক কাহিনী-কাব্য

অ) রসূল - বিজয় - জৈনুদ্দিন

আ) রসূল - বিজয় - সাবিরিদ খান

ই) গাজী - বিজয় - শেখ ফয়জুল্লাহ্

গ) হিন্দু ঐতিহাসিক কাহিনী কাব্য :—

অ) গোরক্ষ বিজয় - শেখ ফয়জুল্লাহ্

৩। সংস্কৃতি - সমন্বয় সঞ্জাত কাব্য :—

অ) সত্যপীর - শেখ ফয়জুল্লাহ্

আ) পদাবলী - চাঁদ কাজী, শেখ কবীর, আফজল আলী

৪। শোকগাথা :—

জয়নবের চৌতিশা - শেখ ফয়জুল্লাহ্

৫। জ্যোতিষ - শাস্ত্রীয় কাব্য :—

ক) সায়াৎনামা - মোজাম্মিল

খ) নীতিশাস্ত্রবার্তা - মোজাম্মিল

৬। সঙ্গীত শাস্ত্রীয় কাব্য :—

রাগমালা - শেখ ফয়জুল্লাহ

(পৃষ্ঠা - ৭৪, ৭৫, ডক্টর মহম্মদ এনামুল হক - মুসলিম বাংলা সাহিত্য)

উপরিউক্ত মুসলিম কবিদের কাব্যের শ্রেণী-বিভাজন থেকে দেখা যাচ্ছে যে তাঁদের কাব্যে কাহিনী কাব্য ও ধর্মীয় সাহিত্যই অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। আবার কাহিনী কাব্যগুলিতে নর-নারীর প্রেম উপাখ্যানই উপজীব্য হয়ে উঠেছে। সুফীতত্ত্বের রূপকে আশিক-মাশুকের অর্থাৎ জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনের কথা কাব্যগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকলেও এর মধ্যে যেন বাংলা উপন্যাসের প্রাক্ রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। কাব্যের চরিত্রগুলি কোথায় যেন হয়ে ওঠে বাস্তব সমাজ থেকে উঠে আসা রক্তমাংসের মানুষ। ষোড়শ শতাব্দীর দৌলত উজির বাহরাম খানের লেখা 'লায়লী মজনু' কাব্য ফারসী কবি জামীর 'লাইলি মজনু' কাব্যের ভাবানুবাদ। এই কাব্য এই শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা উত্তম মানের কাব্য। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের ভাষায়, ''নিছক কাব্য-রস, লিপি চাতুর্য, ভব্যতা ও শালীনতায় 'লায়লী মজনু'র সমকক্ষ কাব্য খ্রীস্ট্রীয় ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যে একটিও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"[৪৯]

(পৃষ্ঠা-৬৮, প্রাগুক্ত)

এই সিদ্ধান্ত থেকেই ষোড়শ শতকের নারীর যে সামাজিক অবস্থান, সেই অবস্থান থেকে কীভাবে 'লায়লী মজনু' কাব্যের প্রধান নারী চরিত্র লায়লী যুগ প্রতিনিধি স্বরূপ হয়ে উঠেছে তার নিরিখে কাব্য-অভ্যন্তরে পুনরায় প্রবেশ করা অত্যন্ত আবশ্যক। পূর্বেই আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পেয়েছি, এই কাব্যের আরেক নারী চরিত্র লায়লীর মায়ের সামাজিক অবস্থান। দেখেছি একজন নারী কিভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কাছে নতিস্বীকার করেই নিজের কণ্ঠস্বরে কথা না বলে যুগ প্রতিনিধি হিসেবে তার মত জ্ঞাপন করে। মেয়ের ভালো

লাগা, মন্দ লাগার থেকে তার কাছে অধিক গুরুত্ব পায় তার নিজের পরিবার তথা সমাজের জন্য দায়িত্ব পালন।

অন্যদিকে লায়লী চরিত্রের ক্রমবিবর্তন যদি আমরা লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাই প্রবল সামাজিক বিধি নিষেধ তার উপর জারি করা হলেও সে আপন কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয় না। মজনুর প্রতি তার হৃদয়ের আবেগকে শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রশমন করা যায়নি। পাঠশালায় একত্রে অধ্যয়নকালে মজনুর সঙ্গে লায়লীর প্রেমের যে সূচনা হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটে মজনুর জন্য বিরহজনিত শোকবিহ্বল অবস্থায় মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে। বাল্যকাল থেকে শুরু করে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাকে প্রবল বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবু সে তার আত্মনিষ্ঠ স্থির সঙ্কল্প থেকে সরে আসেনি। প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সব যুগের নারীদের জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কাছে নতিস্বীকার করতে হয়। পাশ্চাত্য দেশেও ষোড়শ শতাব্দীতে মেয়েদের ব্যক্তি - স্বাধীনতা প্রায় ছিল না বললেই চলে, যখন আমরা দেখতে পাই —

"The social structure of sixteenth century Europe allowed women limited opportunities for involvement, they saved largely as managers of their households. Women were expected to focus on practical domestic pursuits and activities that encouraged the betterment of their families, and more particularly, their husbands. In most cases education for women was not advocated - it was thought to be detrimental to the traditional

female virtues of innocence and morality. Women who spoke out against the patriarchal system of gender roles, or any injustice, ran the risk of being exiled from their communities, or worse; vocal unmarried women in particular were the targets of witch-hunts."[৫০]

(Feminism in Literature Essay - Women in the 16th, 17th and 18th Centuries)

এ থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, যুগ-কাল-স্থান নির্বিশেষে মেয়েদের অবস্থা চিরকালই ছিল ভয়াবহ। পরিবারের গৃহস্থালীর কাজের মধ্যেই তাদের গতিবিধি নির্ধারিত রাখাকেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামো সবসময় সমর্থন করে এসেছে। আর যে বা যারা এর প্রতিবাদ করবার জন্য সোচ্চার হয়ে উঠেছে তাদের জীবনই করে তোলা হয়েছে দুর্বিষহ। ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস্ তার 'The Origin of the Family, Private Property and the State' গ্রন্থে যথার্থই বলেছিলেন "He is the bourgeoisie and the wife represents the proletariat."[৫১]

এখান থেকে আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে সমাজে মেয়েদের অবদমনের চিত্রটা সব সমাজেই ধ্রুবক হিসেবে থেকে যাচ্ছে। তারই মধ্যে অজস্র সামাজিক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে যায় কোনো কোনো মেয়ে তাদের অদম্য আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে। বাহরাম খান সৃষ্ট লায়লী চরিত্রের বিশ্লেষণেও আমরা অনুসন্ধান করবো যে সে কতটা বাহ্যিক বাধা বিপত্তিকে পরাস্ত করে আপন শক্তিতে বলীয়ান হতে পেরেছিল। ইব্নসালাম-এর পুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করা হলে কাব্যমধ্যে সে অকপটে বলে ওঠে —

''এক প্রাণনাথ বিনে না করিমু আন।।

এক নারী দুই পতি নাহিক সুগতি।

একদেশে দুই নৃপ কোথাত বসতি।।

মজনু মোহর অতি প্রাণের দুর্লভ।

তান প্রেমে রোগ মোর পরম উচ্ছব।।

কবেহ আনের সঙ্গে নাহি মোর ভাল।

আনলে তুলাএ মেলা সহজে জঞ্জাল।।''[৫২]

(পৃষ্ঠা - ১৩৮, লায়লী মজনু)

নিজের প্রেমিককে জনসমক্ষে স্বামী বলে সোচ্চারে বলে ওঠার মধ্য দিয়ে লায়লী চরিত্রের দৃঢ় ব্যক্তিত্বের পরিচয়ই কোথায় যেন প্রকাশ পায়। শুধু তাই নয়, পিতামাতার স্থির করে দেওয়া বিবাহপ্রার্থী পাত্রকেও সে গ্রহণ করতে অসম্মত হয়। এখানেই শেষ নয়। এরপরেও যখন দেখা যায় তাকে জোর করে ঐ পাত্রের সঙ্গেই বিয়ে দেওয়া হয় এবং বাসরঘরে তার স্বামী প্রবেশ করে, তখন লায়লীকে দেখা যায় —

''ক্রুদ্ধ হৈল যুবতী আনল সমসর।

চরণ প্রহার দিয়া করিল অন্তর।।

.....

কুবুদ্ধি জন্মিল তোহ্মার হেন কর আশ।

বামন হৈয়া চাহ ছুঁইতে আকাশ।।

কাকের মুখেত যেন সিন্দূরিয়া আম।

কাঞ্চন সহিতে যেন কাচ এক ঠাম।।

কুকুরের গলে যেন অপসর ভূষণ।

শিষের উপরে যেন নাসার রতন।।

তোর ফান্দে বন্দী না হৈব মোর মন।

এরাজ্যের অধিপতি আছে আন জন।।"[৫৩]

(পৃষ্ঠা - ১৬২)

সদ্যবিবাহিত স্বামীর সঙ্গে লায়লীর এহেন আচরণ ও নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে ব্যক্ত করার জন্য তার স্পষ্ট উচ্চারণ-মধ্যযুগের একজন নারীর পক্ষে সত্যিই অভাবনীয়। বৈষ্ণব পদসাহিত্যের প্রধান নারী চরিত্র রাধাও পরিবারকে বা বলা ভালো স্বামীকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে উঠতে পারেনি। কিন্তু লায়লী প্রথম রাতেই তা করতে সক্ষম হয়ে উঠেছিল। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে আমরা যেমন বড়াই চরিত্রকে পাই, এখানেও পাই লায়লীর একজন সখী হেতুবতীকে যে ক্রমাগত লায়লীকে বোঝানোর প্রচেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধাকে প্রণয়াসক্ত করে তুলতে কূটনী জাতীয় নারী চরিত্র বড়াই সক্ষম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হেতুবতীর শত প্রচেষ্টাও শেষ পর্যন্ত বিফলে যায় — ''অনেক প্রকার মুঞি করিলুঁ রচন। ফিরাইতে না

পারিলূঁ কুমারীর মন।।”[৫৪] (পৃষ্ঠা-১৫৯) সেদিক থেকে কাব্যের আদ্যোপান্ত নিবিড় পাঠে লায়লী চরিত্রের স্থিরসঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত না হতে থাকা দেখে আধুনিক পাঠকও অবাক না হয়ে থাকতে পারে না।

লায়লীকে দেখে আরও বিস্মিত হতে হয় যখন দেখা যায় মজনুকে পাবার জন্য কাব্যের শেষদিকে অরণ্যের মধ্য দিয়ে উটের পিঠে চড়ে সে যাত্রা করে। খুঁজে বার করে মজনুকে। ক্ষীণতনু মজনুকে অধিক গৌরচন্দ্রিকা ব্যতিরেকে বলে ওঠে,

‘‘পরিণয় কর মোরে সদয় হৃদএ।
করিএ তোহ্মার সেবা এক মন কাএ।”[৫৫]

(পৃষ্ঠা ১৯৭, প্রাগুক্ত)

রাজকন্যাকে পাবার জন্য ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাজপুত্রের সাত সমুদ্র তেরো নদী অতিক্রম করে অভিযাত্রার ছবি প্রায়শই আমরা রূপকথার কাহিনী থেকে শুরু করে আরব্য রজনী বা অন্যান্য গল্পগাথায় পাঠ করে থাকি। কিন্তু এ যেন সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র! একমাত্র নিজের ইচ্ছার অধীনে থেকেই যেন লায়লী তার জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যায় আত্ম-নির্ধারণ করে।

মধ্যযুগের আরেকটি জনপ্রিয় কাব্যধারা হল সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল। এই কাহিনীধারার চারজন কবির কাব্য পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন দোনা গাজী চৌধুরী, আলাওল, ইব্রাহিম ও মালে মুহম্মদ।

মধ্যযুগের অন্যান্য কবির মতো দোনা গাজী চৌধুরীর কাল নিয়েও পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট বিতর্ক বর্তমান। ত্রিপুরা জেলা থেকে তাঁর কাব্যের খণ্ডিত পুথি পাওয়া গেছে। কবির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী শুধু এটুকুই পাওয়া যায় যে তাঁর বাসস্থান দোলআই বা দোল্লাই গ্রাম। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের মতানুসারে তিনি ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ের।[৫৬] ভাষা ও রচনারীতির বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই তাঁর এই অভিমত।

সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল কাব্যের উৎস আরবী আলেফ লায়লা। কাহিনীটিতে রূপকথার আভাস পাওয়া যায়। নায়িকা বদিউজ্জামালকে লাভ করার জন্য নায়ক সয়ফুলমুলুকের দুর্ধর্ষ অভিযানই কাব্যে স্থান পেয়েছে।

এই কাব্যে 'রাজার পুত্রকামনা' শীর্ষক অধ্যায়ে রাজাকে বলতে শোনা যায়,

''ভাবিল মোহর জন্ম গেল অকারণ
পুত্রহীন বৃথা মোর কি ছার জীবন।
পুত্র বিনে কি লাগিয়া জিএ নরজাতি
পুত্র বিনে সংসারেত কি সুখে বসতি।
পুত্র বিনে মিত্র নাহি পাত্র বিনে রাজা
সত্য বিনে ধর্ম নাই আস্থা বিনে প্রজা।''[৫৭]

(দোনা গাজী বিরচিত সয়ফুলমুলুক
-বদিউজ্জামাল, আহমদ শরীফ
সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,
পৃষ্ঠা-৭)

সমাজে কন্যা অপেক্ষা পুত্র সন্তানের প্রতি অধিক আস্থার এক চিত্র এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। রাজার জবানিতে কবি এই চরম বাস্তব সত্যকেই তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন। শুধু তাই নয় পুত্রলাভের আশায় মিশররাজ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে। কাব্যে তার সম্ভোগ চিত্র বর্ণনায় কবি দোনা গাজীর ভাষায় কিছুটা হলেও স্থূলতা ধরা পড়ে। এখানে দেখতে পাওয়া যায়,

''অধরে মাধুরী পান করে ঘনে ঘন
ভোজনের আদ্যে লোকে ভৈক্ষএ লবণ।
ক্ষেণেকে সাবুটি করে তুলি লএ কোলে,
ক্ষেণেকে চুম্বএ পুনি ধরি তার গলে।''[৫৮]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ২৩)

কাব্যমধ্যে বদিউজ্জামালের রূপ বর্ণনায় মধ্যযুগের রূপ বর্ণনা সম্বলিত গতানুগতিক কাঠামো অন্তর্লীন থাকলেও এই অংশের প্রারম্ভের পংক্তিটি উল্লেখযোগ্য।

''বিদ্যাধরী অপ্সরী গন্ধব সমাজে
হেনরূপ কভু না দেখিল দেবরাজে।''[৫৯]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৩৯)

এখানে বদিউজ্জামালের রূপের পাশাপাশি তার বিদ্যাবত্তার প্রসঙ্গও উল্লিখিত হয়েছে। তবে দোনাগাজীর ভাষায় অনেক সময়ই আদিরসাত্মক ভাবের বাড়াবাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। তাই তাঁর কাব্য অনেকাংশেই প্রকৃত উৎকর্ষতা অর্জনে অক্ষম হয়। ওয়াকিল আহমদ এ প্রসঙ্গে

যথার্থই বলেছেন,

> ''নরনারীর সম্ভোগচিত্রে অশ্লীলতার পরিচয় আছে। কবির বর্ণনা অত্যন্ত নগ্ন, স্থূল এবং কামোদ্দীপক। এতে কাব্যের শিল্প-সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে। রোমান্টিক কবিগণ যখন সুযোগ পেয়েছেন, তখনই প্রেমিক-প্রেমিকার রতিক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন। দোনা গাজী সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। ... দেহ সর্বস্ব এ প্রেমে কেবল 'প্রকৃতি' আছে, 'আর্ট' নেই।''[৬০]
>
> (ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, পৃষ্ঠা - ১৯৭)

পঞ্চদশ শতকে শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে মুসলিম কবির রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান রচনা শুরু হয়। ষোড়শ শতকে এসে দেখা যায় মূলস্রোতের বাংলা কাব্যের থেকে তাঁদের কাব্যের প্রকৃতিগত তারতম্য বিদ্যমান। হিন্দু কবিরা মূলত মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, জীবনী, পদাবলী সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁদের কাব্যে উপস্থিত নারী চরিত্রের গতানুগতিক অবস্থান অধিকাংশক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে মুসলিম কবির কাব্যের নারীরা অনেক সময়ই তাদের প্রেমিকা সত্তা নিয়ে কাব্যমধ্যে সজীবতার সঙ্গে উপস্থিত। বেশিরভাগ কাব্যই সুফীতত্ত্বাশ্রয়ী রূপকে নির্মিত হলেও তার মধ্য দিয়ে সমাজে

নারীর অবস্থানের কিছুটা হলেও আভাস পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতকের মুসলিম কবিদের সৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন নারী-চরিত্র নিয়ে আলোচনার অন্তিম পর্বে এসে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে প্রত্যেকটি নারী চরিত্রই কিন্তু একে অন্যের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। তাদের যেন কোনো নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে বন্দী করা যায় না। মধুমালতী, বিদ্যা, বদিউজ্জামাল, লায়লী-এরা প্রত্যেকেই শুধুমাত্র অন্যের (কোনো পুরুষ চরিত্রের) পরিচয়ে পরিচিত নয়, আপন স্বাতন্ত্র্যেও মনে রাখবার মতো। এছাড়া লায়লী চরিত্রটির নাম আলাদাভাবে উল্লেখ করতেই হয়। কারণ ষোড়শ শতকের নিরিখে লায়লীর মতো দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, প্রেমের প্রতি একনিষ্ঠতা ও দৃপ্ত কণ্ঠস্বর সত্যিই বিরল দৃষ্টান্ত। এভাবেই সমাজের প্রতি, পরিবারের প্রতি আনুগত্য নয়, এক প্রতিবাদের, প্রতিরোধের বয়ান নির্মিত হতে থাকে মুসলিম কবিদের নারী চরিত্রগুলির ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে।

তথ্যপঞ্জী

১. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, (ভারত সরকার প্রকাশিত, ১ম খণ্ড) পৃষ্ঠা ৮৯, ২৫৬, (Secondary reference), উদ্ধৃতিটি গৃহীত হয়েছে : আহমদ শরীফ, বাঙলার সূফী সাহিত্য (ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০১১), পৃষ্ঠা ১৫

২. বৃহদারণ্যক, (Secondary reference), আহমদ শরীফ, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪৪

৩. দৌলত উজির বাহ্‌রাম খাঁ বিরচিত লায়লী মজনু, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স,নভেম্বর ২০০৬), পৃষ্ঠা ২৮

৪. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বাংলা সাহিত্যের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যযুগ, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, এপ্রিল ২০০২), পৃষ্ঠা ২৪৩

৫. লায়লী মজনু, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৭

৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০২

৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৪

৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯২

৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯২

১০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৩

১১. The Kamasutra of Vatsayana, translated by Sir Richard F. Burton, Jaico Publishing House, 1976, Page 27

১২. বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, (কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ১৯৯৯), পৃষ্ঠা ২৯৭

১৩. লায়লী মজনু, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪১-৪৫

১৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৫

১৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৬

১৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫

১৭. আহমদ শরীফ সম্পাদিত মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ (ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০০২) পৃষ্ঠা ৭৫

১৮. ডক্টর আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃষ্ঠা ২৯০

১৯. মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ, পৃষ্ঠা ৩৩

২০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩

২১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫২

২২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৯

২৩. প্রমথ চৌধুরী, প্রবন্ধ সংগ্রহ, (কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, জুন ২০১০), পৃষ্ঠা ২২৫

২৪. শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ, ১, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০৯), সঙ্গিনী কাব্যগ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৯১

২৫. সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, (কলকাতা : এন বি এ, জুলাই ২০১০), পৃষ্ঠা ১৩০

২৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৩

২৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯, ২০০০) পৃষ্ঠা ২০৫

২৮. মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩

২৯. আজহার ইসলাম, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুন, ১৯৯২), পৃষ্ঠা ৩৫

৩০. মুকুন্দ চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, সম্পাদনা সনৎ কুমার নস্কর, (কলকাতা : রত্নাবলী, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯), পৃষ্ঠা ২৩৮, ২৩৯

৩১. বরুণ কুমার চক্রবর্তী, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যে লোকসাংস্কৃতিক পরিবেশ' প্রবন্ধ, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গবেষণা পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, সত্যবতী গিরি ও সনৎ কুমার নস্কর সম্পাদিত, ফাল্গুন-শ্রাবণ, ১৪০৯, পৃষ্ঠা - ১১০

৩২. মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ, পৃষ্ঠা ৪৩

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬

৩৪. বৈষ্ণব পদাবলী, চয়ন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯, পৃষ্ঠা ৩৯

৩৫. Maya Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings, Edited Harold Bloom, (New Delhi : Viva Books Private Limited, 2007), Page 59

৩৬. মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৪

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৬

৩৮. লায়লী মজনু, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৫

৩৯. লায়লী মজনু, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৬, ১০৭

৪০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৩

৪১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২৩

৪২. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, (ঢাকা : খান ব্রাদার্স, ডিসেম্বর ২০০৬) পৃষ্ঠা ২১২

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১২

৪৪. লায়লী মজনু, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০২

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৮

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪০

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১২, ১১৪

৪৮. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, এপ্রিল ২০০১) পৃষ্ঠা ৭৪, ৭৫

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৮

৫০. Feminism in Literature, Introduction, Edited by Jessica Bomarito, Jeffrey W. Hunter. Vol. 1, Gale Centage, 2005, Page 5

৫১. Frederick Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State, The Family, Chapter II, (Zurich, Hottenzen, Vol. 3, 1884), Page 4

৫২. লায়লী মজনু, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৮

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬২

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৯

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৭

৫৬. মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬২

৫৭. দোনা গাজী বিরচিত সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী ১৯৭১) পৃষ্ঠা ৭

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৯

৬০. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৭

পঞ্চম অধ্যায়

সপ্তদশ শতকের মুসলিম কবির কাব্যে নারী

''যে শকটের এক চক্র বড় (পতি), এবং এক চক্র ছোট (পত্নী) হয়, সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না; সে কেবল একই স্থানে (গৃহকোণেই) ঘুরিতে থাকিবে। তাই ভারতবাসী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।''[১]

(রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, মতিচূর, রোকেয়া রচনাবলী, ১৯৭৩, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৮)

শুধুমাত্র ভারতবাসীই নয়, যেকোন জাতির উন্নতির জন্য সমাজ ও সংসারে নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদা থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগে বা প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে লিঙ্গ বৈষম্যই যেন স্বাভাবিক — এমন ধ্যান-ধারণারই অনুশীলন করা হয়ে থাকে। র‍্যাডিকাল ফেমিনিসম বা সংস্কারবাদী নারীবাদ প্রচলনের অনেক বছর আগেই ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস তাঁর 'Origins of the Family, Private Property and the State গ্রন্থের 'The Family' অধ্যায়ে বলেছিলেন, "... within the family he is the bourgeois and the wife represents the proletariat."[২]

(Chapter II the Family : 4. The Monogamous Family, March-May, 1884, Hottinzen Zurich, Vol.3)

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতেও দেখানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের মুসলিম কবিদের কাব্যে সমাজে নারীর অবস্থানের গতিপ্রকৃতি। এই অধ্যায়ের উপজীব্য বিষয় সপ্তদশ শতকের মুসলিম কবির কাব্যে নারীর সামাজিক অবস্থান। পূর্বে উল্লিখিত দুটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমেই একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে ওঠে সমাজ-সাহিত্য সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষ-এই সামাজিক লিঙ্গ বৈষম্য দেশ-কাল নির্বিশেষে সর্বজনবিদিত।

সপ্তদশ শতকের কাব্যের নিবিড় পাঠের নিরিখে এ বিষয়ে পর্যালোচনা করার পূর্বে আমাদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন এই শতকে বাংলা সাহিত্যচর্চার ও তার বিকাশের ইতিবৃত্ত। বিশিষ্ট লেখক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বলেন, ''বঙ্গের বাহিরে বঙ্গভাষা সেবার দুইটি নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় : একটি বৃন্দাবন, অপরটি রোসাঙ্গ। এই উভয়স্থানে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একটি নবীন জীবন ও রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।''[৩]

(মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, বাংলা
সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ১ম খণ্ড,
ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ-২২৯)

বলা বাহুল্য, রোসাঙ্গে মুসলিম কবিদের লেখা বাংলা কাব্য এতই সমাদৃত হয়েছিল যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও এক গৌরবোজ্জ্বল পরম সম্পদ। দৌলত কাজী, আলাওল এই শতকের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম। রোম্যান্টিক প্রণয়-উপাখ্যান ও অধ্যাত্ম সুফী সাধনা - এই দু'ধরনের শিল্পরীতিরই চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল এই সপ্তদশ শতকে। দৌলত কাজী ও

সৈয়দ আলাওল ছাড়াও এই শতকের আর কয়েকজন স্বল্পখ্যাত মুসলমান কবির পরিচয় এসময় পাওয়া যায় তাঁরা হলেন — শেখ মুত্তালিব, মুহম্মদ খান, মীর মুহম্মদ সফী, মুহম্মদ ফসীহ, নসরুল্লাহ খান, আবদুল হাকীম, সৈয়দ মর্তুজা, মরদন প্রমুখ। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই কোন না কোন রাজসভায় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। আবার কারো কারো পূর্বপুরুষ তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত থাকার সুবাদে সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। শেখ মুত্তালিবের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তিনি ও তাঁর পিতা শেখ পরাণ দুজনেই ছিলেন তাঁদের সমসাময়িক বিখ্যাত কবি। 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' নামক গ্রন্থে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হককে তাঁর সম্পর্কে বলতে শোনা যায়, ''তিনি দেশে অত্যন্ত সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। ... তাঁহার কিফায়িতুল-মুসল্লীন নামক ইসলাম ধর্মীয় গ্রন্থখানি দেশে এতই সমাদৃত হইয়াছিল যে, বাংলা ও আরবী উভয় হরফে তাঁহার গ্রন্থটির বহু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে।''[৪]

(ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম
বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ২০০১,
পৃষ্ঠা - ১২৯)

কবি মুহম্মদ খানের ক্ষেত্রে দেখা যায় কবির পূর্বপুরুষরা চট্টগ্রামের প্রায় তিনশ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর লেখা 'সত্যকলি বিবাদ সংবাদ' নামক কাব্য থেকে এই তথ্য পাওয়া যায় যে ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কবি এই কাব্যটি রচনা করেছেন। তাঁর

মক্তুল হুসেন কাব্যটি লেখা হয়েছিল ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর কাব্যসংখ্যা সাত। সেগুলি হল — 'সত্যকলি বিবাদ সংবাদ', হানিফার লড়াই, আসহাবনামা, মক্তুল হুসেন, কিয়ামতনামা, দজ্জালনামা ও কাসিমের লড়াই।

এই শতকের প্রথমার্ধের আরেক উল্লেখযোগ্য কবি হলেন মীর মুহম্মদ সফী। কবি সৈয়দ সুলতানের পৌত্র ছিলেন মুহম্মদ সফী। মুহম্মদ খান তাঁর 'মক্তুল হুসেন' কাব্যে সৈয়দ সুলতানকে তাঁর গুরু হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পীরালী ছিল তাঁদের বংশগত পেশা। মীর মুহম্মদ সফীর তিনটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। নূরনামা, নূরকন্দীল ও সায়াৎনামা।

সপ্তদশ শতকের আরেকজন কবি আবদুল হাকিমের পিতা আবদুর রজ্জাকও কবি ছিলেন। ভুলুয়ার রাজা বলরামের সভাপতি ছিলেন তিনি। ডক্টর রাজিয়া সুলতানা তাঁর 'আবদুল হাকিম কবি ও কাব্য'গ্রন্থের কবি পরিচিতি অংশে উল্লেখ করেন যে আবদুল হাকিম 'সয়ফুলমুলুক ও লালবাণু' নামক একটি কাহিনী কাব্য রচনা করেন।[৫]

(প্রসঙ্গসূত্র --- ডক্টর রাজিয়া সুলতানা, আবদুল হাকিম : কবি ও কাব্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা - ১৯)

অন্যদিকে বৈষ্ণব পদকর্তা হিসেবে এই শতকের একজন মুসলিম কবির নাম সুবিদিত, তিনি হলেন সৈয়দ মর্তুজা। ষোড়শ শতকের শেষার্ধ থেকে সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভের দিক

পর্যন্ত তাঁর জীবনকাল বিস্তৃত।

আরাকানের রাজা শ্রীসুধর্মার সময়ে কবি মরদন আবির্ভূত হন। তিনি একটি মাত্র কাব্য লিখেছিলেন যার নাম ''নছিরা নামা'' বা 'নসীরা নামা'। এই কাব্য পাঠ করলেই বুঝতে পারা যায় যে, তিনি রাজা শ্রীসুধর্মার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।

এই শতকেরই অপর এক বিখ্যাত কবি ছিলেন কোরেশী মাগন ঠাকুর। রোসাঙ্গের রাজা নরপতিগীর অমাত্য ছিলেন তিনি। মাগন ঠাকুর 'চন্দ্রাবতী' কাব্য রচনা করেছিলেন। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে, ''মাগন ঠাকুর ছিলেন রোসাঙ্গের রাজপুত্র, অতএব মগ। মগেরা পুরোপুরি হিন্দু না হোক মুসলমান ছিল না।''[৬]

(ডক্টর সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৯৮)

ড: সেনের মতকে স্বীকার করে নিলে মাগন ঠাকুরকে নিয়ে আলোচনার পূর্বে আরও একবার ভেবে দেখা প্রয়োজন সপ্তদশ শতকের মুসলিম কবিদের কাব্য আলোচনায় এই কবির কাব্য নিয়ে পর্যালোচনা যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা। এই প্রশ্ন থেকেই যায়।

এই শতকেই আবদুল করিম খোন্দকার রোসাঙ্গের রাজকোষাধ্যক্ষ আতিবর এর আদেশে 'দুল্লা মজলিস' কাব্য রচনা করেন।

উপরে উল্লিখিত কবি ছাড়াও সপ্তদশ শতকে আরও অনেক মুসলমান কবির সন্ধান

পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন শামশের আলী, মুহম্মদ আকবর, মুহম্মদ আকিল, আবদুন নবী, শেখ সেরবাজ চৌধুরী প্রমুখ। এই শতকে নিশ্চয়ই আরও অনেক মুসলমান কবি কাব্য বা পদ রচনা করেছেন যাদের নাম ইতিহাস দুর্ভাগ্যক্রমে লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারেনি কিম্বা যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে তাঁদের পুথিগুলি কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে।

সপ্তদশ শতকের যে কবিদের নাম ও তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন রাজসভার রাজার আনুকূল্য লাভ করেছেন কিম্বা তাঁদের পূর্বপুরুষরা রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেছেন। তবে এই শতকের মুসলিম কবি বলতেই প্রথমেই যে দুজনের নাম সবসময় আলোচনার শীর্ষে সর্বাগ্রে থাকে তাঁরা হলেন দৌলত কাজী ও আলাওল। বলা বাহুল্য রোসাঙ্গ রাজগণের অনুকূল সাহচর্য এই দুজনেই লাভ করেছিলেন। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত দৌলত কাজীর লোর চন্দ্রাণী ও সতী ময়না কাব্যের ভূমিকায় কবিকথা অংশের প্রথমেই দেখা যায়, ''একজন নিজের সম্পর্কে মিতবাক আর আর একজন প্রতিটি কাব্যের ভূমিকায় বিস্তৃত আত্মপরিচয় দিয়েছেন।''[৭] বলার অপেক্ষা রাখে না যে এখানে প্রথম জন দৌলত কাজী ও আলাওল হলেন দ্বিতীয় জন।

(দৌলত কাজীর লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না, সম্পাদনা - দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৬, পৃষ্ঠা - এগারো)

দৌলত কাজী রোসাঙ্গ রাজসভার আনুকূল্য লাভ করেছিলেন সেকথা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। রোসাঙ্গ এর রাজা সুধর্ম ও লস্কর উজীর আশরফ খানের গুণকীর্তন কাব্যের রাজপ্রশস্তি অংশে তিনি করেছেন। এমনকি 'বিসমিল্লা আর রহমান রহিম আল্লাহ করিম এর বন্দনাতেও তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেন,

''শ্রী আশরফ খান ধর্মশীল গুণবান

মুসলমান সবার প্রদীপ''[৮]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৩)

এছাড়া 'রোসঙ্গ রাজস্তুতি' নামে একটি অধ্যায়ের অবতারণা দৌলত কাজি করেছেন শুধুমাত্র আরাকান অধিপতি শ্রীসুধর্ম এবং তাঁর উজীর আশারফ খানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য। এই অংশে বারংবার আশরফ খানকে 'ধর্মরাজ পাত্র শ্রী আশরফ খান' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখান থেকে আরও একটি তথ্য পাওয়া যায় যে এই উজীর 'হানাফী মোঝাব ধরে চিস্তি খানদান' এর ছিলেন। এখানে বলে রাখা ভালো হানাফী মোঝাব সুন্নী মুসলমানদের ধর্মসম্প্রদায় এবং চিস্তি খানদান বলতে চিস্তি বংশোদ্ভুত বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সুফী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মুইনউদ্দীন মহম্মদ চিস্তির উত্তরপুরুষ ছিলেন তিনি। কবি দৌলত কাজী নিজেও ছিলেন চিস্তি বা চিশ্‌তী সম্প্রদায়ভুক্ত। সুফীদের মধ্যে চারটি উপসম্প্রদায় ছিল — চিশ্‌তী, কাদেরী, সুহরাবর্দী এবং নক্‌স্‌বন্দী। অন্যদিকে আলাওল ছিলেন কাদেরী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

এতসব কথা বলার একটাই উদ্দেশ্য যে এই কবিরা নিজেরা উদারপন্থী সুফীধর্মে বিশ্বাসী

ছিলেন বলেই এঁদের রচিত কাব্যগুলিতেও সুফীধর্মের প্রভাব লক্ষ করা যায়। সুফী ধর্ম প্রেমময় আরাধনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। নরনারীর প্রেমের মাধ্যমে পারমার্থিক প্রেমের অন্বেষণই সুফী ধর্মের মূল কথা। আশেক মাশুক বা প্রেমিক-প্রেমিকার যে প্রেম সম্পর্ক তা যেন জীব ও আল্লার সম্পর্কের অনুরূপ। সুফীরা উপাসনা করেন না। তারা আরাধনা করেন। ক্ষুদ্র আমি'র আবরণ ঘুচিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলনেই জীবনের সার্থকতা। ইরাণীয় সুফীচেতনায় বিরহকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পরমাত্মাকে লাভ করার রাস্তা কখনই সহজ হয় না। অনেক কষ্টার্জিত পথেই সাফল্যের সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখেছি ইউসুফ - জোলেখা বা লায়লী - মজনুকে। একে অপরকে লাভ করার জন্য ক্রমাগত সাধনা করে গেছে। শুধুমাত্র নর-নারীর পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ বা প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির আলেখ্য হিসেবে নয়, পরমাত্মার কাছে পৌঁছনোর জন্য জীবাত্মার ক্লান্তিহীন আকুতিই যেন প্রকাশিত হয়েছে কাব্যগুলির মধ্য দিয়ে।

দৌলত কাজীর লোরচন্দ্রাণীর কাহিনীর সঙ্গে মৌলানা দাউদের মসনবী চান্দায়ন এর কাহিনীর কিছুটা সাদৃশ্য আছে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত প্রাচীন লোকগাথা - লোরিকমল্লের কাহিনী থেকেই অনুসৃত হয়েছে কাব্যগুলির আখ্যানভাগ।

এখন প্রশ্ন হল দৌলত কাজী কেন এই প্রাচীন লোকগাথা বা মৌলানা দাউদের কাব্য থেকে কাহিনী কাঠামো গ্রহণ করেছেন?

ডক্টর সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন — ''এই কাহিনীর ইতিহাস অনুসরণ করলে

আমরা পৌঁছাই চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। জ্যোতিরীশ্বর কবি শেখরাচার্য বর্ণনরত্নাকরে লোরিক-নাচো-র উল্লেখ করেছেন। তাঁর সময়ে পূর্বভারতের স্থান বিশেষে লোর-চন্দ্রাণীর নাটগীতি নিশ্চয়ই বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। আধুনিক কালে দক্ষিণ বিহারে আহীরদের মধ্যে লোরিক-মল্লের গান মহাকাব্যিক বিস্তার লাভ করেছে। বিহারী লোরিক - মল্লের গীতের পরিচয় শিক্ষিত সমাজে প্রথম প্রচার করেন গ্রীয়রস।"[৯]

(ডক্টর সুকুমার সেন - ইসলামি
বাংলা সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স,
কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৩২)

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে চতুর্দশ শতকের শুরুর দিক থেকেই এই লোরক কাহিনী জনসমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বহুল প্রচলিত লোকগাথাকে কেন্দ্র করে কাব্য লেখার রীতি আমাদের দেশে চিরায়ত। মৌলানা দাউদও সেই রীতি অনুসরণ করে মসনবী চান্দায়ন রচনা করেন। সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে পাওয়া যায় যে লাহোর মিউসিয়মে লোর চন্দ্রানীর কাহিনী-নির্ভর চব্বিশটি চিত্র সংরক্ষিত আছে যা জৈন পারসিক মিশ্র রীতিতে আঁকা।[১০] (পৃষ্ঠা ২৮৪) অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে এই কাহিনী সে সময়ে অত্যন্ত পরিচিত এক লোক কাহিনী ছিল। দৌলত কাজীও তাই এই কাহিনী অবলম্বনে রচিত মসনবী চান্দায়ন এর অনুবাদ করেন। তবে একথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন আলাওলের 'পদ্মাবতী' যেমন জায়সীর 'পদুমাবৎ' এর সার্থক অনুবাদ কাব্য, দৌলত কাজীর কাব্য সেখানে তাঁর আপন

সৃষ্টি মহিমায় মৌলিক কাব্য হয়ে উঠেছে।

মুল্লা দাউদের চন্দ্রায়ণ কাব্যটি বর্তমানে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। অবধী হিন্দীতে রচিত এই কাব্যটি আনুমানিক ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়। দৌলত কাজীর কাব্যটি যদিও শুধুমাত্র এই কাব্যটির উপর ভিত্তি করে অনুবাদ করা হয়নি। লোরচন্দ্রানীকে ঘিরে যেমন একাধিক লিখিত কাব্য রচিত হয়েছিল সেই প্রত্যেকটি কাব্যেরই প্রভাব দৌলত কাজীর লোরচন্দ্রাণী কাব্যে অল্পবিস্তর পড়ে।

এই কাব্যের নাম নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক আছে। 'লোরচন্দ্রাণী' নাকি 'সতীময়না' — কোন্ নামটি এর প্রকৃত নাম এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য বর্তমান। কবি নিজে কাব্যটির শুরুতে একে আবার 'ময়নার ভারতী' বলে উল্লেখ করেছেন। কাব্যটির একাধিক উৎস কাব্য থাকার জন্যই অনুমান করা যায় একাধিক নাম নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল।

আমরা 'লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না' কে একটি কাব্য হিসেবে ধরেই পর্যালোচনা করার প্রচেষ্টা করব যে সপ্তদশ শতকের নিরিখে এই কাব্যে নারীর অবস্থান।

'লোরচন্দ্রাণী' কাব্যাংশে 'বন্দনা' ও 'রোসঙ্গ রাজস্তুতি'র পরেই দেখা যায় 'ময়নাবতীর রূপ বর্ণনা' অধ্যায়টি। নারীর রূপবর্ণনার চিরাচরিত প্রথা সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেই সূত্রগুলিকে মাথায় রেখেই বলা যায় এই কাব্যের ক্ষেত্রেও সেই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি। ময়নার রূপ-বর্ণনায় কবিকে অকপটে বলতে শোনা যায়,

‘‘অধর বান্ধুলি রুচি কত মধুভাষে।

সুন্দর দশন পাঁতি মুকতা প্রকাশে।।

ঘনচয় রুচিকেশ সিন্দুরে শোভন।

প্রভা ছাড়ি ভানু যেন তিমির শরণ।।

সুবর্ণ কর্ণিকা কর্ণে মণি কর্ণপুরে।

দোসর অরুণ দোলে চন্দ্রিমার কোরে।।

সুকোমল ভুজদণ্ড কিশলয় কর।

শিরিস মঞ্জরী পরে শোভয় ভ্রমর।।

নিবিড় নির্মল কুচ কনক কমল।

মন্মথ-মথিএ যেন পূর্ণ সিরিফল।।

নাভিকুণ্ড নহে রতিক্রীড়ার সর্বস্ব।

মদনের বিহা হেতু মঙ্গল কলস।।’’[১১]

(লোরচন্দ্রাণী, পৃষ্ঠা - ১২)

এত বিশদ বিবরণের উদ্দেশ্য একটাই পরবর্তী অধ্যায়েই দেখা যায় যে পরমাসুন্দরী ময়নাবতীকে পরিত্যাগ করেও লোর একা বনবিহারে যায়। কবিরা তাঁদের কাব্যে সরাসরি না বললেও একথা যেন সমাজ-নীতিতে পরিণত হয়েছিল যে স্বামীকে রূপ দ্বারা আকৃষ্ট করে সংসারে ধরে রাখবার দায়িত্ব পালন যেন যেকোনো স্ত্রীরই একান্ত কর্তব্য। কিম্বা বলা যায় সমাজ

রীতির প্রতিফলনই পড়েছিল তখনকার সাহিত্যে। পুরুষ এক নারীতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তাদের একাধিক নারীসঙ্গ সমাজ-স্বীকৃত ছিল। 'লোরের বনবিহার' অংশে প্রথমেই দেখা যায়,

''লোরক রাজন চলি গেল বন

এক নারী নাহি সঙ্গে

ছাড়ি কলানিধি রূপের অবধি

ভোলে বনস্পতি রঙ্গে।।"[১২]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৪)

এ থেকে বোঝা যায় পুরুষের বহুগামিতার সামাজিক অনুমোদন ছিল বলেই কাব্যে তা অনায়াসে স্থান পায়। লোরের জন্য ময়নার বিলাপ অংশেও দেখতে পাওয়া যায় ময়না বলে ওঠে,

''পুরুষ ভ্রমর কঠিন কলেবর

ভিতরে বাহিরে কালি।

যবে মত্ত মতি পূরি মনঃপ্রীতি

আর পুষ্পে করে কেলি।।[১৩]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৬)

তখন বুঝতে পারা যায় লোরের চরিত্রের স্বরূপ জানতে পেরেও অসহায় ময়নার তার জন্য বিলাপ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। সে এই অংশেই আরও বলে,

''কেমনে স্ত্রীজনা ধরিব আপনা

পুরুষ নিঠুর জাতি।।''[১৪]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৬)

শাস্ত্রমতে বিয়ের পর স্বামী অন্য নারী সংসর্গ করছে জেনেও স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রতিই একনিষ্ঠ থাকাকেই সমাজ সতীত্ব বলে বিবেচনা করে। এই কাব্যের আখ্যান-ভাগে ময়না চরিত্রটির নামের পূর্বে 'সতী' বিশেষণ যুক্ত করার পিছনেও এই একই যুক্তিই কার্যকরী হয়। মিয়া সাধনের 'মৈনাসৎ' থেকে সতীময়না অংশটি অনূদিত হলেও এই কাব্যের 'মৈনা' বা ময়না - নায়িকার নামের পূর্বে কোনো বিশেষণ যুক্ত করা হয়নি।

কাব্যটির 'চন্দ্রাণীর দাম্পত্য' অংশেও নারী চরিত্রের ভিন্ন মাত্রা পরিবেশিত হয়। চন্দ্রাণীর অনেকজন সখীর পরিচয় পাওয়া যায় যারা হল পদ্মলীলা, সমুঙ্গলা, সুলোচনা, রম্যমালা। বৈষ্ণব পদসাহিত্যে যেমন দেখা যায় শ্রীরাধিকার জীবনের সুখ-দুঃখের সহচরী হয়ে ওঠে তার সখীরা, এখানেও যেন সখীগণ সক্রিয়, কুমারী চন্দ্রাণীকে নানাভাবে সহায়তা করার জন্য।

'কুমারি আদেশ শিরে লই সখীগণ'কে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। চন্দ্রাণীর আদেশে তারা —

''সুগন্ধি শীতল জলে ধোলায়ন্ত পাও।

কোন সখী শীতল চামরে করে বাও।।

সত্ত্বরে যোগায় কেহ সুবর্ণ আসন।

কেহ রাজ উপযোগ্য যোগায় বসন।।

কোন সখী ভৃঙ্গারের জল সুবাসিত।

যোগায় কুমার তৃষ্ণা বুঝিয়া ইঙ্গিত।।"[১৫]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩)

এছাড়াও বুদ্ধিশিখা নামের এক চতুর ধাত্রীর (ধাঞি) পরিচয় এখানে পাওয়া যায় যে চন্দ্রাণীকে একান্তে নানা পরামর্শদানের মাধ্যমে দাম্পত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার প্রচেষ্টা করে। তার নিজ নামই যেন তার চরিত্রের দ্যোতক হয়ে ওঠে। এখানে কোথাও যেন বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এর রাধার সর্বক্ষণের পরামর্শদাত্রী বড়াই চরিত্রের ছায়া বুদ্ধিশিখার মধ্যে এসে পড়ে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মুল্লা দাউদের চন্দায়ন কাব্যে ধাই-এর নাম ছিল বৃহস্পতি। কবি দৌলত কাজি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি এই প্রবাদ বাক্য মনে রেখেই ধাইয়ের এই নামকরণ করেছেন। নিজের বয়সের থেকে বয়স্ক কোনো কারোর কাছ থেকে বুদ্ধি গ্রহণ করা এই রীতির মূল কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের পৌঁছে যেতে হবে লোকসমাজে। বাস্তব জ্ঞান বা বুদ্ধি গোষ্ঠী মানুষ বংশানুক্রমিকভাবে একে অন্যকে দান করে থাকে। গোষ্ঠী চেতনা থেকে উদ্ভূত এই ধারণারই প্রতিফলন বারবার সাহিত্যে ঘটতে দেখা যায়। আর নারীজাতি যে এই রীতির ধারক ও বাহক ছিল তার প্রমাণ নিহিত আছে আমাদের অধুনা প্রচলিত স্ত্রী-আচার, ব্রতকথা ইত্যাদির মধ্যেও।

এই অধ্যায়ে আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করা যায় যে রতিসুখ লাভ করার জন্য নায়িকা চন্দ্রাণী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। সপ্তদশ শতকের নিরিখে এটি খুবই আধুনিক যে নারী তার নিজের সুখের জন্য ভাবছে ও সখীদের আদেশ করছে,

''আস্তে ব্যস্তে কুমারী পাঠায় সখীগণ

প্রবোধিয়া আন গিয়া অবুঝ বামন।।

.....

যৌবন কালেত কন্যা বড় চিন্তা পায়।

অনঙ্গ ভুজঙ্গ বিষ সর্বাঙ্গে বেড়ায়।।''[১৬]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -২৫)

চন্দ্রাণীর কামজ্বালা নিবারণের পন্থা এর পরেই ব্যক্ত করা হয়েছে —

''সে বিষ নামাইতে নাহি ওঝার শকতি।

স্বামী সে চিকিৎসা হেতু ঔষধ সুরতি।।

সুরাসুর নর পশু যত জীবগণ।

সুরতি সম্ভোগ বিনে না ধরয় প্রাণ।।।''[১৭]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ২৫)

দৌলত কাজি নির্দ্বিধায় কাব্যে একজন নারীর অন্তরের জ্বালার হেতু ও তার সমাধানের পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মহাবীর বামনের উদ্দেশ্যেও তিনি যেন আগে থেকে সাবধানবাণী

নির্দেশ করেছেন —

''অন্তঃপুরে নারী থুইয়া না যাও নিকট।

পুষ্প উপেক্ষিয়া যেন ভ্রমর কপট।।

চকোর হইয়া চান্দ পাশেত না যাও।

আঁখির গোচরে রত্ন দিবসে হারাও।।''[১৮]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ২৬)

অথবা এও হতে পারে চন্দ্রাণীর লোরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হওয়ার পূর্ব-পটভূমিকা কবি আগে থেকেই জোরালো যুক্তির দ্বারা স্থাপন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কারণ 'চন্দ্রাণীর দাম্পত্য' নামাঙ্কিত অধ্যায়ের শিরোনাম পাঠ করে পাঠকের মনে অনেক আশার সঞ্চার ঘটলেও পুরো অধ্যায়টি পাঠ করে তাদের আর বুঝতে বাকি থাকে না যে চন্দ্রাণীর দাম্পত্যজীবন যে মোটেই সুখের ছিল না।

কাব্যের 'চন্দ্রাণীর খেদ' অংশে দেখা যায় যে নপুংসক স্বামীকে নিয়ে জীবন অতিবাহন করতে করতে চন্দ্রাণী হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছে। সে তার মায়ের কাছে আত্মবিলাপ করেছে তার ব্যর্থ যৌবনের ইতিবৃত্ত জানিয়ে। সে দ্বিধাহীনভাবে বলে উঠেছে,

''স্বামীহীন নারীর কি ফল সংসার।

বিফলে বঞ্চয় নিশি রমণী যাহার।।

স্বামীহীন গুণি নিশি সীদতি অঙ্গনা।

হৃদে কামানল জ্বলে দক্ষিণ পবনা।।"[১৯]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৩৭)

এখানেই শেষ নয়, সে আরও বলে,

"মূঢ় স্বামী সঙ্গে ক্রিয়া সহস্র জঞ্জাল।

একাকিনী সময় গোঁয়াই সেই ভাল।।

ভিন্ন এক মন্দির রচিয়া দেও মোকে।

সখিগণ সঙ্গে তথা থাকিমু কৌতুকে।।

পুনি যদি তাকে মোকে করাও মিলন।

গরল ভক্ষিয়া মুঞি তেজিমু জীবন।।"[২০]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৩৮)

যে সমাজে নারীর কণ্ঠস্বর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুনতে পাওয়া যায় না বা সচেতনভাবে শোনানো হয় না, সেই সমাজ ব্যবস্থায় চন্দ্রাণীর এহেন উচ্চারণ যথেষ্ট প্রকারের প্রগতিশীলতার পরিচায়ক। কারণ ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র, সমাজ-সংস্কৃতি বারবার একথাই বলে যে স্বামী যেরকমই হোক না কেন তার প্রতি একনিষ্ঠ থাকা ও পতির সেবা করাই নারীর একমাত্র ধর্ম। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে দৌলত কাজী সমাজ স্রোতের প্রতিকূলে গিয়ে এমন কাহিনী লিখলেন কেন? উত্তর হিসেবে বলা যায়, দৌলত কাজীর সামনে ছিল দুটি কাহিনী। মুল্লা

দাউদের চন্দ্রায়ণ বা চান্দায়ণ এবং মিয়া সাধনের মৈনাসৎ — এই দুটি কাব্য থেকে কাহিনীর আখ্যানভাগ তিনি গ্রহণ করে অনুবাদ করেছিলেন। তাহলে কি দেখা যায় যে মূল চন্দ্রায়ণ গ্রন্থে নারীর দৃপ্ত উচ্চারণের আভাস ছিল? এক্ষেত্রে বলা যায় দৌলত কাজী তাঁর কাব্যের অনেক অংশে অনেক কিছু সংযোজন করেছেন এবং সে কারণেই তাঁর কাব্য প্রায় মৌলিক কাব্য হয়ে উঠেছে।

কাব্যের ভূমিকা অংশ থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানতে পারা যায়,

> ''চন্দ্রাণীর সঙ্গে বামনের নিষ্ফল দু-রাত্রি যাপনের বৃত্তান্ত দাউদে নেই। দাউদের কাব্যে বামনের সঙ্গে চান্দার দাম্পত্য-নিষ্ফলতার পরোক্ষ বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু দৌলত এর প্রত্যক্ষ বিবরণ দিয়ে লোর চন্দ্রাণীর সম্পর্কটিকে বাস্তব মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। চন্দ্রাণী বামনের সঙ্গে সুস্থ দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বামনের যৌন অসামর্থ্যই চন্দ্রাণীকে পরপুরুষের দিকে ঠেলে দিয়েছে। দাউদের পরোক্ষ ইঙ্গিত দৌলতে প্রত্যক্ষ চিত্র হয়ে উঠেছে।''[২১]
>
> (পৃষ্ঠা-চব্বিশ ভূমিকা অংশ, প্রাগুক্ত)

অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে দৌলত কাজি তাঁর নিজের যুগ-অনুপাতে এই কাব্যকে উপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যেই চন্দ্রাণীর ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। আবার আরও

একটা সম্ভাবনা স্বল্প হলেও থেকেই যায় লোরক মল্লের এই কাহিনীর মৌখিক ও লিখিত অনেকগুলো সংস্করণ পাওয়া যায়। এই উপাখ্যান নিয়ে সারা ভারতবর্ষে অনেক কাব্য লেখা হয়েছিল। ভোজপুরী, ভাগলপুরী, মৈথিলী, মির্জাপুরী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয় এই কাব্যটি। দৌলত কাজি মুল্লা দাউদের চান্দায়ন কাব্য ছাড়াও অন্য কোনো লোর - চন্দ্রাণী - উপাখ্যান থেকেও তাঁর কাব্যের এই অংশের অণুপ্রেরণা পেতে পারেন। এর কোনো লিখিত বা মৌখিক প্রমাণ পাওয়া না গেলেও এই অনুমান সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা যায় না।

কাব্যে এর পরের অংশে দেখা যায় চন্দ্রাণীর রূপ অবলোকন করে যোগী জ্ঞান হারায়। কাব্যের শুরুতে ময়নামতীর রূপবর্ণনা কবি করেছেন। চন্দ্রাণীর ক্ষেত্রে নিজে প্রত্যক্ষভাবে বিবরণ প্রদান না করে যোগীর প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে চন্দ্রাণীর অপরূপ সৌন্দর্যের পরিচয় কবি দিয়েছেন।

এই অংশে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করার মতো যে লোরককে যোগী, চন্দ্রাণীর রূপের বর্ণনা দেবার সময় বলে,

''চন্দ্রাণীর তোহ্মার মিলন মনোরম।
বিদ্যা সনে সুন্দরের যেন সমাগম।।''[২২]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৪৪)

এথেকে বোঝা যায় 'বিদ্যাসুন্দর' এর কাহিনী সপ্তদশ শতকে রীতিমত জনপ্রিয় ছিল। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য তখনও রচিত হয়ে ওঠেনি। চৌরপঞ্চাশিকার নায়ক-নায়িকা

সুন্দর ও বিদ্যার কাহিনী সমাজে এতই প্রচলিত ছিল যে ষোড়শ শতকেও একজন মুসলমান কবি সাবিরিদ খান 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেছিলেন, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দৌলত কাজীর এই কাব্যে বিদ্যাসুন্দর এর প্রসঙ্গ একবার নয়, বারবার ফিরে ফিরে এসেছে। 'চন্দ্রাণী কর্ত্তৃক লোর দর্শন' অংশেও দেখতে পাওয়া যায় —

''চন্দ্রাণীর রূপ ভাবি লোরক ফাফর।

বিদ্যারূপে মত্ত যেন বৈদেশী সুন্দর।।''[২৩]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৪৭)

অন্যদিকে এই অধ্যায়েই লোরকে দেখে চন্দ্রাণীর পূর্বরাগ যেমন বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীরাধিকার কৃষ্ণের জন্য পূর্বরাগের সঙ্গে তুলনীয়।

''যব ধরি কুমারকে দেখিলা কুমারী।

মন বান্ধা দিয়া তনু লই গেল হরি।।

সখীগণ সঙ্গে বালা না করে মিলন।

তেজিল ভূষণ ভোগ অঙ্গের চন্দন।।

মলিন চিকুর তনু মলিন অম্বর।

দিবস চন্দ্রিমা যেন বদন ধূসর।।

নাহি খায় তাম্বুল না করে জলপান।

দিনে দিনে ক্ষীণ তনু নিশ্চল নয়ান।।

কার সঙ্গে মুখে যদি কহয় কথন।

চিত্তেত কল্পয় সেই রূপ অনুক্ষণ।।

শীতল শয্যাত নিদ্রা না আইসে নয়নে।

ক্ষণে আলাপয় ক্ষণে বিলাপে আপনে।।" [২৪]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৪৮)

এই অংশের সঙ্গে বৈষ্ণব পদকর্তা চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের একটি পদে রাধার অবস্থার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

''রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা

বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে

না শুনে কাহারো কথা।"[২৫]

(বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, (চয়ন), ২০১১, পৃষ্ঠা-২৯)

কাব্যের অন্তর্গত চন্দ্রাণীর প্রতিবিম্ব দর্শনে লোরের মূর্ছা অংশটির মাধ্যমে চন্দ্রাণীর রূপ-সৌন্দর্যের কথাই কবি ব্যক্ত করেছেন। এর আগে তার রূপ দেখে একজন যোগীও

অজ্ঞান হয়ে যান। একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি কবি সচেতন ভাবেই করেছিলেন চন্দ্রাণীর রূপের অতুলনীয়তাকে বোঝানোর জন্য। কারণ মুল্লা দাউদের চন্দ্রায়ন কাব্যে চন্দ্রাণীর রূপ দেখে লোরের মূর্ছা ইত্যাদি ঘটনা নেই। মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যে মুকুরে বিম্বিত পদ্মাবতীর রূপ দর্শনে আলাউদ্দীনের মূর্চ্ছা ঘটনাটির সঙ্গে এই অধ্যায়টির তুলনা করা যায়।

'দেবীমন্দিরে লোরচন্দ্রাণী সাক্ষাৎ' অংশেও চন্দ্রাণীকে অকপটে বলতে শোনা যায়,

''ধাঞিকে দেখিয়া বালা প্রসন্ন বদন।
হরিষে পুছয় বালা লোর বিবরণ।।
কহ কহ মোর প্রাণনাথের সংবাদ।
খণ্ডৌক বিরহ জ্বালা মদন বিবাদ।।''[২৬]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৫৮)

দৌলতে কাজীর কাব্যে নারীর কণ্ঠস্বর প্রায় সর্বত্র শুনতে পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে শুধুমাত্র চন্দ্রাণীই নয়, অপ্রধান চরিত্র বৃদ্ধা ধাই-এর বক্তব্যও লোর - চন্দ্রাণীর সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে বারবার উঠে আসে। চন্দ্রাণীকেই কেবলমাত্র নয়, লোরকেও সে নির্দ্ধিধায় বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে গেছে। নিজেকে বৈদ্য বলে পরিচয় দিয়ে ধাই লোরাকে বলে,

''হাসিয়া বোলয় বৃদ্ধা এই কোন্ কথা।
নিমেষে বুঝিলুঁ তোর মর্মে কামব্যথা।।

তোহ্মার অন্তরে দহে মদন গরলে।

নিবারণ নহে মোর বৈদ্যশক্তি বলে।।

ঔষধ নহে এ কামবিষ নিবারণ।

কাম নির্বিষের মন্ত্র প্রিয়া দরশন।।"[২৭]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৫৮)

'লোর ও চন্দ্রাণীর মিলন' অংশেও চন্দ্রাণীকে রতিকার্যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। নারীসুলভ (?) লজ্জার আবরণে সে নিজের অদম্য যৌন আকাঙ্ক্ষা বা ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় যাকে 'লিবিডো' বলা হয় তাকে গোপন করে রাখার প্রচেষ্টা করেনি। বরং লোর ও চন্দ্রাণী দুজনকেই 'কামরসে রতিশাস্ত্রে দোহান বিদ্বান' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এখানে পুনরায় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের প্রভাব লক্ষ করা যায় যখন লোরকে দেখা যায়,

''রসপুরে সখী সবে বেড়িয়া কুমার।

গোপীগণ মধ্যে যেন গোপাল বিহার।।"[২৮]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৭)

বিদ্যাসুন্দরের প্রসঙ্গও এই স্থানে এসে পড়ে প্রাসঙ্গিকভাবেই,

''বিদ্যার সম্পাশে যেন বসিল সুন্দর।

দূরে গেল বদনের লজ্জার অম্বর।।"[২৯]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৭)

একাদশ শতকের সংস্কৃত কবি বিহলণের লেখা 'চৌরপঞ্চাশিকা'র অন্তর্গত 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যান এর প্রভাব কিম্বা ষোড়শ শতকে রচিত শাহ বিরিদ খান রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনীর প্রভাব দৌলত কাজীর কাব্যে যে এসে পড়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সিঁধ কেটে সুন্দর যেমন বিদ্যার কাছে যেত, তেমনই চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য দড়ির সাহায্যে লোর তার কাছে এসে পৌঁছত। বিদ্যাসুন্দরের প্রণয় বিবাহপূর্ব গোপন প্রণয়। এখানে বিদ্যা তার প্রণয়ী নির্ধারণে অভিভাবকদের উপর নির্ভর করেনি।

'লোরচন্দ্রাণীর সন্ধানে বামনের অভিযান' অংশে বামনের প্রতি লোরের একটি উক্তি উল্লেখ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

''পুরুষ ভ্রমর জাতি মধু যথা পায়।
সুগন্ধী কমল নারী রস তথা ধায়।।''[৩০]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৭৬)

নিজে পুরুষ হয়েও লোরের এই আত্ম-উপলব্ধি বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সমাজে পুরুষ ও নারীর যে dichotomy বা চারিত্রিক বৈপরীত্য তা যে সর্বকালের ক্ষেত্রেই সত্য তা যেন আরও একবার প্রমাণ করে। পুরুষ বা নারী - এই দুই জাতিই যে প্রকৃতপক্ষে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে তার অভিজ্ঞান আমরা সাহিত্যে খুঁজে পাই। 'লোরচন্দ্রাণী' কাব্যে নারী চরিত্রদের আধিপত্য লক্ষ করার মতো হলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ফসল হিসেবে এই কাব্যের চরিত্র লক্ষণকে উপেক্ষা করা যায় না। কাব্য-কাঠামোর মধ্যেই নিহিত থাকে

নারীর - অবদমনের টুকরো টুকরো ছবি। এক নারীকে লাভ করার জন্য দুই পুরুষের মধ্যে সংগ্রামের মধ্যেও যেন সেই চিত্রই ধরা পড়ে। নারী যেন কোনো জীবন্ত সত্তা নয়। তাকে পণ্য হিসেবে গণ্য করার রীতি আদিম কাল থেকেই যেন চলে আসছে। 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' প্রবাদটিও নারীকে দখলের ক্ষেত্রেই বারবার প্রয়োগ করা হয়। সপ্তদশ শতকে লিখিত এই কাব্যেও যেন সেই ছায়ারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যায়।

আবার 'লোরচন্দ্রাণী' আখ্যানের শেষভাগে এসে 'চন্দ্রাণীর মিলন' অংশেও দেখতে পাওয়া যায় শেষ পর্যন্ত লোরের কাছে সে নিবেদন জানায়,

''কুলরক্ষা কর নাথ বংশের উদয়।
বৃদ্ধ বাপ মাও মোর করহ সহায়।।
মুঞি বড় পরাধিনী দুর্গতি পাপিনী।
মোর হেতু আকুলতা জনক জননী।।
সব তেজি তোহ্মাকে ভজিলুঁ নিজপতি।
পতিবিনে নারীর নাহিক আনগতি।।''[৩১]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৯৯)

নপুংসক বামনকে বিবাহ করার পর চন্দ্রাণীর ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের পরিচয় আমরা কাব্যের প্রারম্ভেই পেয়েছি। নিজের যৌবন বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্যই চন্দ্রাণীকে কাব্যের অনেকাংশে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। কিন্তু নারী যে নিরাপত্তার জন্য শেষ

পর্যন্ত পুরুষের কাছে নতিস্বীকার করে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় উপরে উল্লিখিত পদসমূহের মধ্য দিয়ে। সপ্তদশ শতকের প্রেক্ষিতে চন্দ্রাণী যেন নারীজাতির যুগ-প্রতিনিধি হয়ে ওঠে এই অংশে। নিজ কর্মের জন্য নিজেকে 'দুর্গতি পাপিণী' বলতেও সে কুণ্ঠাবোধ করে না। পতিকে অগ্রাহ্য করে 'উপপতি'কে পতির মর্যাদায় আসীন করার পশ্চাতে কোথাও যেন সামাজিক লিঙ্গ চেতনার বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করার মধ্য দিয়েই জেগে ওঠে চন্দ্রাণীর অপরাধবোধ। তাই সে লোরকে পরিবারের অনুমতিতেই পতিরূপে মর্যাদা দিয়ে সেই গ্লানি থেকে মুক্ত হতে চায়। কবি দৌলত কাজী সচেতনভাবেই তাঁর নিপুণ কলমে লিপিবদ্ধ করেন চন্দ্রাণীর সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক রূপ। যুগ চাহিদাকে স্বীকার করে যুগধর্মকে মেনে চলে তাঁর কাব্য হয়ে ওঠে তাই যুগোত্তীর্ণ।

চন্দ্রাণীর মতো চরিত্র-সৃষ্টির সামাজিক দ্বিধা থেকেই সম্ভবত দৌলত কাজী তাঁর কাব্যের পরবর্তী অংশে সতীময়নার মতো 'সতী' নারীর চরিত্র অঙ্কন করেন। চৌপাঈ-দোহা-সেরেটায় রচিত কবি মিয়া সাধনের হিন্দী কাব্য 'মৈনাসৎ' থেকে এই অংশের অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন হয়। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হরিহর দ্বিবেদীর সম্পাদনায় গোয়ালিয়র থেকে সাধনের 'মৈনাসৎ' এর পুথিটি প্রকাশিত হয়। ১৫১৫ সালে অধ্যাপক হাসান আসকারী পাটনার মানের শরীফের দরগা থেকে ফারসী হরফে লেখা আর একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্যটি রচিত হয়েছিল বলে জানতে পারা যায়।

মুল্লা দাউদের চন্দায়ন কাব্য ও সাধনের 'মৈনাসৎ' কাব্যের দুটি পৃথক কাহিনীকে একটি

কাহিনীতে পরিরত করে দৌলত কাজী 'লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না' কাব্যকে একসূত্রে বেঁধেছিলেন। অনুবাদ কর্ম হলেও তাঁর মৌলিক ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে একজন বিবাহিতা নারীর সামাজিক মর্যাদা কীভাবে ক্ষুণ্ন হত তা কবি ময়না চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলায় প্রচেষ্টা করেছেন। 'লোরচন্দ্রাণী' অংশের 'ময়নার বিলাপ' অধ্যায়ে তাই দেখা যায় তার প্রতি লোরের অনাগ্রহের কারণে সে কতটা মর্মাহত হয়েছে,

''মর্মে পাইলুঁ ঘাও মুখে না আইসে রাও

প্রেমানলে তনু পোড়ে।।

কহে সুরঙ্গনা শুন সতী ময়না

ধৈর্য ধর দিন চারি।''[৩২]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৭)

চার দিন মাত্র নয়, ময়নাকে তার স্বামী লোরকের জন্য বারো বছর অর্থাৎ এক যুগ 'ধৈর্য' ধরে একনিষ্ঠতার সঙ্গে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তাকে 'একসরী' করে রেখে লোর অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তা নীরবে স্বীকার করে নিয়েই পতি বিহনে ময়নাকে দিনযাপন করতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যের প্রক্ষিপ্ত অংশ 'রাধাবিরহ' খণ্ডের রাধার কথা মনে পড়ে। স্বকীয়াই হোক বা পরকীয়া, পুরুষের মন অতি চঞ্চল। তাই ত্রয়োদশ শতকে রচিত কাব্যে বা সপ্তদশ শতকের কাব্যে নারীর প্রতি পুরুষের আচরণ যেন

সমভাবাপন্নই থেকে যায়। দৌলত কাজীর কাব্যমধ্যে এই উপলব্ধির অনায়াস প্রকাশও উল্লেখ করার মতো।

''যুবক নিষ্ঠুর জাতি পুরুষ দুরন্ত।

এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শান্ত।।''[৩৩]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৩)

'সতীময়না' অংশটি 'বিরহিনী-ময়নার কাছে রত্নামালিনীর আগমন' অধ্যায়টি দিয়ে আরম্ভ করা হয়। এখান থেকেই সাধনের মৈনাসৎ কাব্য অবলম্বনে এই কাব্যটি অনূদিত হয়। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত দৌলত কাজির 'লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না' কাব্যটিতে সম্পাদক কর্তৃক এই তথ্য পাওয়া যায়,

''... সম্ভবত দৌলতের কাছে এমন কোনো হিন্দী পুথি ছিল যার প্রথমদিকে ছিল দাউদের চন্দায়ন এবং শেষে ছিল সাধনের মৈনাসৎ। দৌলত জেনে অথবা না জেনে দুটো পৃথক গ্রন্থকে অনুবাদ মিলিয়ে দিয়েছিলেন।''[৩৪]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১০৩)

দৌলত কাজীর কাব্যের 'সতীময়না' অংশের প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই ময়না সম্পর্কে পাঠক জানতে পারে,

''নিজ রাজ্যে ময়নাবতী দেব ধর্ম সেবে নিতি

স্বামীবর মাগে সর্বকাল।।

সে কামিনী অন্তঃপুরে রম্য সরোবর তীরে

শুচি রুচি কুসুম্ব উদ্যানে।

তথাতে নির্জনে নারী আরাধে শঙ্কর গৌরী

সর্বহিতে স্বামীর কল্যাণে।।

চাহয় রাজ্যের ভাল টুটউক জঞ্জাল

দ্বিজ গুরুজন হোক শান্ত।

এই বর মাগে নারী গৌরীপদ অনুস্মরি

সত্বরে মিলউক নিজ কান্ত।।

দরিদ্র দুঃখিত জন ধন দিয়া তোষে মন

তৎপুরে পূজে অভ্যাগত।

ভাগ্যবতী ময়নারাণী সত্যের প্রতিষ্ঠা জানি

প্রশংসন্তি সকল জগৎ।।"[৩৫]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১০৩)

একজন আদর্শ ভারতীয় নারীকে যে যে গুণসম্পন্ন হতে হয়, ময়নাকে সেই সকল গুণের অধিকারী করে তুলেছেন কবি দৌলত কাজী।

এখানেই পাওয়া যায় প্রোষিতভর্তৃকা রূপবতী ময়নাকে লাভ করার জন্য রত্নামালিনীর মাধ্যমে রাজা নরেন্দ্রর পুত্র ছাতন কুমার বহু প্রচেষ্টা করে। কিন্তু ময়নাকে তার সতীত্ব থেকে

বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না। ময়নাকে পাবার জন্য ছাতন মরিয়া হয়ে ওঠে,

''ময়নার সুরতি আশে ছাতন মদন গ্রাসে

নিত্য ভাবে সে রূপ কামিনী।

রচিয়া কপট বুদ্ধি কার্য যেন হয় সিদ্ধি

আনাইলা রত্না মালিনী।।[৩৬]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১০৩)

রত্না মালিনীও ময়নাকে বিভিন্নভাবে শলা পরামর্শ দিতে থাকে। ময়না কিন্তু নিজের স্বামী ভিন্ন অন্য কোনো পুরুষের প্রতি আগ্রহ দেখায় না। এখানে দেখতে পাওয়া যায়,

''স্মরিতে স্বামীর গুণ শরীরে ভেদিল ঘূণ

শোকে ক্লেশে রজনী পোহায়।।

স্বামীর বিচ্ছেদে রামা ত্রাসেত হরিণী সমা

নিশি দিশি বহে ঘন শ্বাস।

তাজিল ভূষণ হার আঞ্জন চন্দন আর

উপভোগ সুখ পরিহাস।।''[৩৭]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১০৫)

স্বামী - বিরহে ময়নার দুঃখে কষ্টে অতিবাহিত জীবনের ছবি 'সতীময়না' কাব্যাংশ-এ বারবার উঠে এসেছে। এই কাব্যে দূতী মালিনীর সক্রিয় ভূমিকাও লক্ষ করার মতো।

চৌপাঈ-দোহা-সোরঠায় রচিত সাধনের 'মৈনাসৎ' কাব্যেও মালিনী দূতীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ঐ কাব্যটিতে নায়কের নাম ছিল লালন। লালন-বিহনে মৈনার দুঃখ-দুর্দশা দেখে তাকে মালিনী বলে উঠেছিল, —

''জগ জোবন ভূগতৈ সংসারূ।

তৌ পৈ মৈনা বহুত বিচারূ।।

কৈসে কর লজ্জা মোহি রহিয়ৈ।

প্রেম প্রীত মৈনা যোঁ কহিয়ৈ।।''[৩৮]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৬৩)

অর্থাৎ, ''(মালিনী)-এ জগৎ সংসারে সবাই যৌবন উপভোগ করছে। ময়না, তোর জন্য আমার অনেক ভাবনা। আমি থাকতে তোর কিসের লজ্জা?''

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৬৩)

দৌলত কাজীর কাব্যেও ময়নাবতীর সঙ্গ কিছুতেই ত্যাগ করে না মালিনী। তাকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখানোর প্রচেষ্টা করে সে। মালিনী নির্দ্বিধায় বলে ওঠে,

''হেলায় যৌবন যাইব পাছে পাইবা শোক।

পুরুষ মিলাই দেম ভুঞ্জ সুখভোগ।।''[৩৯]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১০৭)

ময়নাবতীও প্রত্যুত্তরে বলে,

''তুঞি ধাঞি পাপী মোকে শুনাওসি পাপ।

এ বুলিয়া ময়নাবতী করে অনুতাপ।।''[৪০]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১০৭)

কাব্যের সমগ্র অংশ জুড়েই থাকে মালিনী ও ময়নার এই মনোভাব। দুজনেই দুজনের দৃষ্টিভঙ্গিতে থাকে অবিচল। এরপরেই শুরু হয়ে যায় ময়নার বারমাসী। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত যাবার আগে মালিনী সম্পর্কে একটি কথা জানিয়ে রাখা ভালো যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থা কী প্রকার, এ বিষয়ে তার যথেষ্ট ধারণা ছিল। 'মালিনীর দৌত্য' অধ্যায়ে তাকে বলতে শোনা যায়,

''জীবন যৌবন রূপ চলয় নিমেষে।

নারী বৃদ্ধ হৈলে তারে না পুছে পুরুষে।।

যৌবন চলিয়া গেলে বিফল জীবন।

সংসারে নরক যার নাহিক যৌবন।।''[৪১]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১০৯)

যৌবন যতদিন থাকে, ততদিনই পুরুষের কাছে নারীর কদর থাকে, এই নির্মম বাস্তব সত্য - শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল দূতী মালিনী। তাই সে কাব্যের অবশিষ্ট অংশেও এই শিক্ষাই দিতে চেয়েছেন ময়নাকে।

এরপর 'বারমাসী' অংশেও দুজনের এই একই আলাপ-আলোচনার বিস্তারিত বর্ণনা

পাওয়া যায়। এখানে আরও একবার উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সাধনের 'মৈনাসৎ' কাব্যেও বারমাসী শুরু হয় আষাঢ় মাস থেকে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। বলা বাহুল্য বারমাসীর অংশ থেকে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের বর্ণনাও অসম্পূর্ণ রেখে দৌলত কাজীর মৃত্যু ঘটে। তাঁর কাব্যের অসমাপ্ত অংশ প্রায় দুই দশক পরে শ্রী সুধর্মার মহাপাত্র সুলেমানের নির্দেশে কবি আলাওল সমাপ্ত করেন।

কবি সাধনের 'মৈনাসৎ' কাব্যকে অনুসরণ করে সতীময়নার 'বারমাসী' প্রথাভিত্তিক বারমাস্যা বা বারমাসীর থেকে পৃথক হয়ে উঠেছে। কৃষিভিত্তিক সমাজ বা লোক সমাজ থেকে উদ্ভূত হয় বারমাস্যা। বারমাস্যাতে থাকে বারো মাস বা সম্বৎসরের বিবরণ। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণে' প্রথম বারমাস্যার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু বাংলাভাষাতেই নয় ভারতের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত হয় এই বারমাস্যা, বা মারমাসিয়া। 'ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা' গ্রন্থে ড: শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ভাষায় রচিত বারমাস্যা সংক্রান্ত গবেষণাধর্মী আলোচনা করেন। বার্ষিক গতির প্রভাবে যেমন ঋতু পরিবর্তন হয় তারই প্রভাবে মানব-মানবীর মনোরাজ্যের পরিবর্তনের গাথাকে বারমাস্যা বলে।

মধ্যযুগে লোকসমাজ থেকে উদ্ভূত এই বারমাস্যা স্থান পায় বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে, মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক ও বণিক খণ্ডে, ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া, মলুয়া, দেওয়ানভাবনা, ভেলুয়া সুন্দরীর পালায় প্রভৃতি বিভিন্ন কাব্যে নায়িকার বারমাস্যার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বারমাস্যা তখন এতই জনপ্রিয়তা লাভ

করেছিল যে শুধু বারোমাস নয় অনেক সময় চার, ছয়, আট, দশ মাসকে অবলম্বন করেও বারমাস্যা রচিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধার চতুর্মাস্যা, কঙ্ক ও লীলা পালায় লীলার যান্মাসিকী, ষষ্ঠীবর দত্তের মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলার অষ্টমাসী বা চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত সীতার দশমাস্যার উল্লেখ করা যায়।

তাই দেখা যাচ্ছে মধ্যযুগে এমন বহুল প্রচলিত সাহিত্য প্রকরণকে দৌলত কাজী তাঁর কাব্যে স্থান দেবেন এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। তাছাড়াও আগেই বলা হয়েছে যে 'মৈনাসৎ' কাব্যকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করার জন্যও তাঁর কাব্যে এই বারমাস্যার অবতারণা।

সতীময়না কাব্যাংশে লক্ষ করা যায় প্রত্যেকটি মাসের প্রথমে একটি বর্ণনামূলক পয়ার ও তার পরবর্তী অংশে একটি গীতাত্মক লাচাড়ি বর্তমান। রত্না মালিনী ও ময়নার উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক নাটগীত বা গীতিনাট্যের ঢঙে কবি এই বারমাসী রচনা করেছেন। প্রতিটি মাসের প্রারম্ভে মালিনীর প্ররোচনা-সম্বলিত পয়ার বিবৃতি ও তার পরের অংশেই ময়নাবতীর গীতিময় প্রত্যুত্তরের ঠাসবুননে নির্মিত হয়েছে এই বারমাসী।

আষাঢ় মাস থেকে শুরু করে অসমাপ্ত জ্যৈষ্ঠ মাসের পশ্চাদ্‌পটে মালিনী - ময়নার উক্তি - প্রত্যুক্তিমূলক বিবৃতি স্থান পেয়েছে এখানে। 'মালিনীর দৌত্য' অংশের মতো এখানেও দূতী মালিনী যেন সমাজ মনস্তাত্ত্বিক এর স্বরে বলে উঠেছে,

''বৃদ্ধ হৈলে নারী যুবকের বৈরী

ফিরে তাকে না পুছারি।

যাইব যৌবন নিশির স্বপন

জীবন দিবস চারি।।”[৪২]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১১)

মধ্যযুগের প্রেক্ষিতে পুরুষের বহুগামিতা সমাজস্বীকৃত থাকলেও নারীর ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় তার মূল্য থাকত যৌবনকাল পর্যন্তই। এই জীবন সত্য বারবার কবি বলতে চেয়েছেন মালিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে। নরেন্দ্রকুমারের পুত্র ছাতনের হয়ে প্ররোচনার জন্যই শুধুমাত্র এই চরিত্রের সৃষ্টি হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই সে যেন সামাজিক প্রতিনিধি হিসেবে সক্রিয় থাকে কাব্যে। মালিনী যখন বলে ওঠে ময়নাকে

‘‘সুরক্ষিত সম্ভোগ তেজে কাহার সাহস।।

দিনে দিনে জীবন যৌবন যায় তোর।”[৪৩]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১১৫)

তখন যেন মনে হয় জীবনের রূঢ় বাস্তব সত্যের জ্ঞান সে সমাজ নির্ধারিত রীতি-নীতি থেকেই গ্রহণ করেছে। কিম্বা

‘‘যে নারীর পুরুষ না থাকে নিত্য পাশ।

বিফল সে রাজরানী জীবন নৈরাশ।।”[৪৪]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১১৮)

— মালিনীর এই উক্তির মাধ্যমেও তৎকালীন সমাজের পুরুষতান্ত্রিক রূপের প্রকৃতি ধরা

পড়ে। নারীর নিরাপত্তা-স্বরূপ পুরুষের অবস্থানের প্রামাণ্য দলিল হয়ে ওঠে সপ্তদশ শতকে রচিত এই কাব্যটি।

অন্যদিকে কাব্যের এই অংশের মুখ্য চরিত্র ময়নার বেদনামুখর সতীত্বের ইতিবৃত্তের মধ্যে নিহিত থাকে সমাজ চাহিদাভিত্তিক নির্মিত 'আদর্শ নারী' চরিত্রের পরাকাষ্ঠা। স্বামীর দ্বারা ক্রমাগত বঞ্চিত হলেও স্বামীর প্রতিই একনিষ্ঠ প্রেমকেই সমাজ 'সতী' নারীর প্রতিমূর্তি রূপে বিবেচনা করে। ময়নার যন্ত্রণাময় কণ্ঠস্বর যখন ধ্বনিত হয়,

''মালিনী কি কহব বেদন ওর।
লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর।।''[৪৫]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১১৪)

তখন যেন তা শুধু ময়নার একার স্বরই নয়, আবহমান কালের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কর্তৃক অবদমিত নারীর অসহায়তার চিত্রেরই জন্ম হয়। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার আর্তির মতোই ময়নাবতীর বিলাপেও যেন ধরা পড়ে নারীর একান্ত আপনার অশ্রুজলের প্রতিবেদন।

আলাওল রচিত 'পদ্মাবতী' কাব্যও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি। মালিক মুহম্মদ জায়সীর লেখা 'পদুমাবৎ' কাব্য থেকে কাহিনী উৎস গ্রহণ করেছেন কবি। মূল কাব্যটি হিন্দী আওয়াধী ভাষায় রচিত। আলাওল নিজেই এই সম্পর্কিত সুস্পষ্ট তথ্য প্রদান করেছেন। 'পদ্মাবতী' কাব্যটি অনুবাদ কর্ম হলেও পরিণত মনের অধিকারী কবি আলাওল নিজ শৈল্পিক গুণে কাব্যটিকে আপন সৃষ্টির মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। কাব্যের অভ্যন্তরে

প্রবেশের পূর্বে অতি সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'পদ্মাবৎ' কাব্যের অস্তুতিখণ্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানতে পারা যায় যে কবি জায়সী, সুফী ধর্মের মুহীউদ্দীনের শিষ্য ছিলেন।

''গুরু মোহদী খেবক মৈঁ সেবা।
চলৈ উতাইল জেহি কর খেবা।।''[৪৬]

(পৃষ্ঠা - ১০, পদ্মাবতী-জায়সী, সম্পাদনা দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ)

এছাড়াও কবির সম্পর্কে জানতে পারা যায় যে তাঁর কাব্যের নাগমতীর বারমাস্যা শুনে অমেথীর রাজা খুবই খুশি হন এবং কবিকে নিজের রাজ্যে নিয়ে যান। কবি চিশতী সম্প্রদায়ের সুফী সাধক ছিলেন। 'পদ্মাবৎ' কাব্যেও তাঁর সুফী মনোভাবের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল।

আমাদের আলোচ্য কবি আলাওলও সুফী ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। কোরেশী মাগন ঠাকুরের নির্দেশে তিনি জায়সীর কাব্যের অনুবাদকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যটি অনুবাদ কাব্য হলেও তা তিনি নিপুণভাবে করেছেন। ওয়াকিল আহমদ যথার্থই বলেছেন,

''মূলের সাথে কোন পরিচয় না রেখে আলাওলের কাব্য পাঠ করলে

আনন্দ ও সৌন্দর্য উপভোগের কোনরূপ অন্তরায় সৃষ্টি হয় না। জায়সীর রচনার এবং আলাওলের রচনার রসাস্বাদন এক নয়। জায়সীর পদ্মাবতী মূলতঃ অধ্যাত্মরসের কাব্য, আলাওলের পদ্মাবতী মুখ্যতঃ মানবরসের কাব্য। জায়সী মিষ্টিক, আলাওল হিউম্যানিস্ট।"[৪৭]

(পৃষ্ঠা-২৮৩, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ওয়াকিল আহমদ, খান ব্রাদার্স, ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০০৬)

আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যকে 'মানবরসের কাব্য' বলে অভিহিত করার সূত্র ধরেই আমাদের অনুসন্ধানের মূল উপজীব্য বিষয়ে পুনরায় আলোকপাত করতে হয়। আলাওল রচিত 'পদ্মাবতী' কাব্যে নারী চরিত্ররা কিভাবে উপস্থিত হয়েছে? কাব্যে অনেকক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায় আলাওল অনেক অংশ সংযোজন করেছেন। একশো বছর পূর্বে রচিত হিন্দির কাব্যটি থেকে কখনও বা যুগ-চাহিদা অনুযায়ী কোনো কোনো অংশ বর্জন বা পরিবর্তনও করেছেন তিনি। আলাওলের কাব্যের 'নাগমতি বিয়োগ খণ্ড' থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা হল,

''চিতাউরে থাকি পন্থ হেরে নাগমতি।
মোর কর্মদোষে ফিরি না আইল পতি।।

পড়িল নাগর কোন নাগরীর বশ।

চিত্ত হোন্তে দূর কৈল মোর প্রেমরস।।” [৪৮]

(‘পদ্মাবতী’ - আলাওল, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০২, পৃষ্ঠা - ২১২)

এই অনুবাদ মূল হিন্দি কাব্যটির সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করা যেতে পারে,

‘‘নাগমতী চিতউর-পথ হেরা।

পিউ জো গএ পুনি কীহ্ন ন ফেরা।।

নাগর কাহু নারি বস পরা।

তেই মোর পিউ মোসৌঁ হরা।।”[৪৯]

(পদ্মাবতী-জায়সী, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৯, পৃষ্ঠা-১৮১)

এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে আলাওলের অনুবাদটি মূল কাব্যের অনুসারী। কিন্তু দ্বিতীয় পক্তির শেষে তিনি ‘পতি’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার অর্থ হল স্বামী। জায়সীর কাব্যে

'পিউ' অর্থাৎ প্রিয় বলে সম্বোধন করেছিল নাগমতী। অনুবাদে এই পরিবর্তন কি ইচ্ছাকৃত? প্রশ্ন থেকেই যায়। এমনটাও হতে পারে যে সমকালীন প্রেক্ষিতে সমাজে প্রোষিতভর্তৃকা নারীর বহুল উপস্থিতিই কবিকে বাস্তবতানির্ভর শব্দচয়নে চালিত করেছিল।

ঐ একই খণ্ডে নাগমতীর বারমাস্যা বর্ণনায়ও আলাওল মূলের তুলনায় অনেক সংক্ষেপে তাঁর কার্য নির্বাহ করেছেন। বাংলা মঙ্গলকাব্যের রীতিতেই তিনি রচনা করেছেন। এক এক মাসের বর্ণনা জায়সীর কাব্যে যেখানে ষোলটি চরণে রচিত, কবি আলাওল তাঁর কাব্যে সেখানে চারটি করে চরণকে স্থান দিয়েছেন। এছাড়াও তা কোনো ভাবেই মূলানুগ নয়। আয়তনে সংক্ষিপ্ত হলেও আলাওল রচিত বারমাস্যায় নাগমতীর বিরহ - বিহ্বল হৃদয়ের আকুতি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এই অংশে দেখতে পাওয়া যায়,

''প্রথম আষাঢ় মাস বরিষা প্রবেশ।
মোর খণ্ডব্রতফলে পহু নাহি দেশ।।
পূর্ণিত গগন ঘন বরিখে সঘন।
পতি বিনে হতভাগী নিষ্ফল জীবন।।
শ্রাবণে বরিষে মেঘধারে অনিবার।
নিঝরে বরিখে রাত্রি দিন একাকার।।
ঝিঙ্কুরে শিখিনী ভেক পাপিয়ার রোলে।
প্রাণ দহে অভাগিনী কান্ত নাহি কোলে।।''[৫০]

(আলাওল-পদ্মাবতী, পৃষ্ঠা -২১২)

স্বামী বিরহে নাগমতীর এই বেদনাবিধুর অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেন প্রেমে বিরহিনী সকল নারীরই কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়। গতানুগতিক প্রথা অনুসরণ করে কবি বারমাস্যাকে কাব্যমধ্যে স্থান দিলেও তাঁর কবি প্রতিভার নৈপুণ্যে তা যেন হয়ে ওঠে যুগোত্তীর্ণ। আবার অন্যভাবে এর মাধ্যমে বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীরাধিকার বিরহ ব্যথিত স্বরের আকুতিও যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

অন্যদিকে কাব্যে 'রত্নসেন বিদায় খণ্ড' অংশে পদ্মাবতী - রত্নসেন -এর বিবাহ পরবর্তী সময়ে, কন্যা পদ্মাবতীকে বিদায় দেবার সময় তার মায়ের শোকাতুর অবস্থা যেন চিরকালীন পতিগৃহে যাত্রার সময় বাঙালী মায়ের চিরপরিচিত দৃশ্যেরই প্রতিচ্ছবি। মূল কাব্যে এই চিত্রটি অনুপস্থিত। যুগ চাহিদা অনুসারেই আলাওল যেন এই অংশের অবতারণা করেছেন। এখানে দেখতে পাওয়া যায়,

''কন্যাকে তুলিয়া ধরি রাজমহাদেবী।
গলাগলি করি কান্দে মনে শোক ভাবি।।
বিস্তর কান্দিয়া দেবী বলে সকরুণে।
কন্যা গৃহে অবতার দুঃখের কারণে।।''[৫১]

(প্রাগুক্ত - পৃষ্ঠা - ২২৯)

এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে আলাওল বাঙালী পরিবার জীবনের চেনা পরিচিত চিত্রকেই

কাব্যমধ্যে অঙ্কন করেছেন।

যে নারীর রূপ যত বেশি সেই নারীই স্বামীকে ধরে রাখতে পারবে এমন ধারণারও প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কাব্যে। সমাজ থেকে উঠে আসা গতানুগতিক ধ্যান ধারণারই রূপান্তর এভাবে ঘটেছে। এই খণ্ডেই পদ্মাবতীর মাকে বলতে শোনা যায়,

''কৃপা করি বিধি তোরে রূপ দিল অতি।
প্রাণের অধিক স্নেহ করে তোর পতি।।
সহস্র সতিনী হৈলে তাতে কিবা ডর।
না হইব তোর সখিজন সমস্বর।।
কন্যা মাঝে ধন্যা হেন তাহারে বাখানি।
স্বামীর সৌভাগ্য পায় জিনিয়া সতিনী।।''[৫২]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ২২৯)

এভাবে নারীর স্বরের মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজজীবনে নারীর অবস্থানের স্বরূপ বুঝতে পারা যায়। আলাওলের বাঙালী সমাজ-সংসার সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনার ভাবধারাও এভাবে প্রকাশিত হয়। সিংহলরাজ, রত্নসেনের কাছে নিজ কন্যা পদ্মাবতীকে সমর্পণ করে। এথেকেও বোধগম্য হয় যে কন্যা সম্প্রদানের বিষয়টি তৎকালীন সমাজে বহুল প্রচলিত ছিল। কারণ জায়সীর মূল কাব্যে এ প্রসঙ্গটি অনুপস্থিত। আলাওলের কাব্যে সিংহলরাজকে অতি বিনয়ের সঙ্গে বলতে শোনা যায়,

''সোঁপিল পরাণী আমি হস্তেত তোমার।।

চক্ষের পোতলী মোর এই কন্যাখানি।

ধন প্রাণ গৃহবাস তাহার নিছনি।।

নির্বান্ধবা একাকিনী দূর দেশে যায়।

মোর হৃদে এই শাল রহিল সদায়।।''[৫৩]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -২৩১)

পিতৃগৃহে মেয়ের প্রতি নিবিড় স্নেহ ও ভালোবাসার চিত্রও আবহমান কালের পরিচিত চিত্রকল্প।

পিতামাতার গৃহে সব মেয়েরই আদর-আপ্যায়ণ মেলে, কিন্তু পতিগৃহে সবসময় তা সুলভ নয়। এই কাব্যেরই অপর এক নারী চরিত্র নাগমতির পতিবিহনে দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ মূর্তি পরিলক্ষিত হয়। চিতোর আগমন খণ্ডে পদ্মাবতীকে নিয়ে রত্নসেন চিতোর রাজ্যে ফিরে আসার পর নাগমতীর মানসিক অবস্থায় করুণ বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়।

নাগমতীর কণ্ঠস্বরে যেন বিশ্ব বিরহিনীর বেদনার সুর ধরা পড়ে।

''ত্রিভুবনে হেন নাহি দেখি নাহি শুনি।

পতি মন আনন্দিত দুঃখিত রমণী।।

শিশু হোন্তে সেবা কৈল হই এক মন।

তিলে পাসরিলা শুনি আনের কথন।।''[৫৪]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ২৫৮)

শুধু তাই নয় পুরুষ চরিত্র সম্বন্ধে নাগমতির ধারণা যে সুস্পষ্ট ছিল তাও প্রকাশ পায় তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে, যখন সে বলে ওঠে,

''অবোধে করয় অলি পুরুষ বিশ্বাস।

নানা ফুলে মধু পিয়ে না পুরয় আশ।।

আনের কারণে তুমি হইয়া গেলা যোগী।

ঝুরিয়া ঝুরিয়া আমি মরি তোমা লাগি।।''[৫৫]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ২৫৮)

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ কুণ্ঠাহীন ভাবেই রত্নসেনও এই দোষারোপকে স্বীকার করে নিয়েই সদম্ভে বলে ওঠে,

''নৃপে বোলে প্রাণপ্রিয়া শুন নিবেদন।

পুরুষ ভ্রমরতুল্য স্বরূপ বচন।।

নানা ফুলে মধু পিয়ে ভ্রমর চরিত।

মালতীর স্নেহ না ছাড়য় কদাচিত।।

শ্রবণে শুনিলে অতি রূপের কথন।

কেমনে পুরুষ পারে ধরাইতে মন।।''[৫৬]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ২৫৯)

অনুশোচনার লেশমাত্র রত্নসেনের কথনে লক্ষ করা যায় না, আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি

যুক্তি-প্রতিযুক্তি সাজাতে থাকেন। আলাওল যে সমাজ প্রতিবেশে কলম ধরেছিলেন, তা ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অধীন। এ প্রকার সমাজ কাঠামোয় পুরুষের বহুগামিতাকে গৌরবের সঙ্গেই যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, কাব্যমধ্যে যেন তারই প্রকাশ ঘটেছে। মুহম্মদ জায়সী রচিত কাব্যে নাগমতী প্রেমিকা হিসেবে চিত্রিত হলেও আলাওলের কাব্যে সে যেন হয়ে উঠেছে পতির প্রতি অনুগতা দাসী। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, নারীদের এভাবে দেখতেই অভ্যস্ত, তার প্রমাণই এভাবে কাব্যে রূপায়িত হয়েছে।

এমনকি পদ্মাবতী-নাগমতী বিলাপ খণ্ডেও রত্নসেনের জন্য পদ্মাবতীর অতিনাটকীয় বিলাপ মূল জায়সীর কাব্যের থেকে অনেকাংশেই পৃথক। নায়কের জন্য নায়িকার এরূপ বিরহ যন্ত্রণায় কাতর হওয়ার মধ্য দিয়েও যেন নারীর যন্ত্রণার থেকেও বড়ো হয়ে দেখা দেয় তার অসহায়তা। কাব্যের এই অংশে দেখতে পাওয়া যায়,

‘‘মুই নারী হতভাগী দুঃখ পাও মোর লাগি
কেনে মোরে না দিলা তুরুকে।
মোর কর্মে যে থাকিত অবশ্য সেই সে হইত
তোমার থাকিত অঙ্গ সুখে।।
রমণী পাদুকা প্রায় তার লাগি না যুয়ায়
নিজ অঙ্গে প্রহার সহিতে।’’[৫৭]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৩২৩)

এখানে 'রমণী পাদুকা প্রায়' এই উপমার মধ্য দিয়ে নারীর নিজেকে একভাবে অপমান করার অর্থই প্রকাশ পায়। সমাজ যেভাবে একজন নারীকে দেখে, নারীও যেন সেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিতেই নিজেকে হীনভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এ যেন সেই পরিচয়কেই বহন করে।

আলাওলের কাব্যের শেষে পদ্মাবতী-নাগমতির সতী হবার পরিণতিও সমাজের অন্ধকারময় নির্মম প্রথার কালচিহ্নকেই বহন করে।

এভাবে আলাওল রচিত 'পদ্মাবতী' কাব্যে নারী প্রসঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। তিনি কখনও জায়সীর মূল কাব্য 'পদুমাবৎ' থেকে হুবহু অনুবাদ করেছিলেন। আবার কখনও বা গ্রহণ, বর্জন, পরিবর্তন করেছিলেন। তাঁর অনুবাদ কাব্য থেকে প্রাপ্ত সূত্রের উপর ভিত্তি করেই কাব্য মধ্যস্থ নারী চরিত্রের বয়ান নির্মাণের প্রচেষ্টা করা হল।

এই শতকেরই অপর এক অন্যতম কবি হলেন কোরেশী মাগন ঠাকুর। মাগন ঠাকুরের প্রসঙ্গ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সুকুমার সেনের অভিমত অনুসারে তিনি মগ। মগরা হিন্দু না হলেও মুসলিম ছিলেন না বলেই তাঁর অনুমান।[৫৮]

(প্রসঙ্গসূত্র-সুকুমার সেন-বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯৮)

আবার মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, কোরেশী মাগন ঠাকুর ছিলেন কোরেশ বংশজাত সিদ্দিকী

মুসলমান।[৫৯]

(প্রসঙ্গসূত্র-ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, পৃষ্ঠা - ১৫৫)

সপ্তদশ শতকের মুসলিম কবিদের আলোচনা প্রসঙ্গে মাগন ঠাকুরের নাম প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়ে। তিনি 'চন্দ্রাবতী' কাব্য রচনা করেছিলেন। এই কাব্যও রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল এর কাহিনীর সঙ্গে এই কাব্যের কাহিনীর অন্তর্মিল আছে। দুটি কাব্যেই দেখা যায় নায়িকাকে লাভ করবার জন্য নায়কের দুর্ধর্ষ অভিযান। 'চন্দ্রাবতী' কাব্যের উৎস সম্পর্কিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে ওয়াকিল আহমদ তাঁর 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' গ্রন্থে বলেছেন,

''বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলির আদি উৎস ভিন্ন ভাষায় পাওয়া যায়, কেবল চন্দ্রাবতীর কাহিনীর প্রাচীন উৎস জানা যায় না। এটি কবির নিজস্ব সংগ্রহ হতে পারে। দেশীয় রূপকথা কবির প্রধান অবলম্বন ছিল।''[৬০]

(ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, খান ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা - ২৫৮)

চন্দ্রাবতীর চিত্রপট অবলোকন করে বীরভান প্রণয়াসক্ত হয়। রূপকথার নায়কের মতোই সে বিভিন্ন বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে নায়িকা চন্দ্রাবতীর সঙ্গে মিলিত হয়। এই কাব্য বিভিন্ন অবাস্তব ঘটনার উপস্থিতিতে রূপকথার জগতে বিচরণ করেছে। নায়ক-নায়িকা পারস্পরিক রূপ - গুণের দ্বারা একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। বীরভানের চিত্র দেখে চন্দ্রাবতীর মনে তার প্রতি প্রবল পূর্বরাগ জন্মায়। বিরহে তাপিত হয়ে সে বীরভানের জন্য প্রতিনিয়ত তপস্যা করে। কাব্যে এস্থানে দেখতে পাওয়া যায়,

''প্রতিদিন চন্দ্রাবতী কন্যা সুচরিতা।

কুমারের রূপধ্যান করে গুণযুক্তা।।''[৬১]

(কোরেশী মাগন ঠাকুর বিরচিত

চন্দ্রাবতী, আহমদ শরীফ সম্পাদিত)

এর মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের এক খণ্ডচিত্র ধরা পড়ে যে সেকালেও কিভাবে প্রেমিককে লাভ করার উদ্দেশ্যে প্রেমিকা কঠোর ধ্যানে আত্মনিমগ্ন থাকত। এই কাব্যে অনেকাংশে রূপকথার আভাস থাকলেও তখনকার সামাজিক প্রতিবেশের টুকরো টুকরো দৃশ্য অনেক সময় ধরা পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, রাজকন্যা রূপবতী ও চন্দ্রাবতীর স্বয়ম্বর-এর প্রসঙ্গ এখানে পাওয়া যায়। পতিকামনায় তাই চন্দ্রাবতী 'আরাধএ দেব ত্রিলোচন।' এর মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় রাজকন্যা অর্থাৎ সমাজের উচ্চ শ্রেণীর নারীদের নিজের স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা কিছুটা হলেও সমাজে প্রচলিত ছিল। যদিও কবি মাগন ঠাকুর রোসাঙ্গের আরাকান রাজের

মন্ত্রী ছিলেন। তাই তাঁর কাব্যের কাহিনীতেও সমাজের শীর্ষে অবস্থানকারী শ্রেণীই যে প্রতিফলিত হবে তা এক অর্থে স্বাভাবিক।

এভাবে সপ্তদশ শতকের নিরিখে মুসলিম কবির কাব্যে নারীর অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন মেজাজে পরিস্ফুট হতে দেখা যায়। কখনও তারা রাজকন্যা, কখনও প্রোষিতভর্তৃকা নারী, আবার কখনও বা পরকীয়া প্রেমের মধ্যেই তারা জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। এসব কিছুর প্রেক্ষিতেই নারীর সামাজিক অবস্থান বোঝার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্যপঞ্জী

১. রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, রোকেয়া রচনাবলী, (ঢাকা : বর্ণায়ন, ২০১০), মতিচূর উপন্যাস, পৃষ্ঠা ৩৮

২. Frederick Engels, The Family, Private Property and the State, The Family, Chapter II, (Zurich, Hottenzen, Vol 3, 1884), Page 4

৩. মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ১ম খণ্ড (ঢাকা : ১৯৬৫), পৃষ্ঠা ২২৯

৪. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, এপ্রিল ২০০১), পৃষ্ঠা ১২৯

৫. ডক্টর রাজিয়া সুলতানা, আবদুল হাকিম কবি ও কাব্য, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী), পৃষ্ঠা ১৯

৬. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৭৫), পৃষ্ঠা ২৯৮

৭. দৌলত কাজি, লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না, সম্পাদনা দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ২০০৬), ভূমিকা, পৃষ্ঠা এগারো

৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩

৯. সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, পৌষ ১৪০০) পৃষ্ঠা ৩২

১০. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮৪

১১. দৌলত কাজি, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২

১২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪

১৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬

১৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬

১৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩

১৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫

১৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫

১৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬

১৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭

২০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৮

২১. পূর্বোক্ত, ভূমিকা, পৃষ্ঠা চব্বিশ

২২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৪

২৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৭

২৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৮

২৫. বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃষ্ঠা ২৯

২৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৮

২৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৮

২৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭

২৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭

৩০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৬

৩১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৯

৩২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৩

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৩

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৩

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৫

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৩

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৭

৪০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৭

৪১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৯

৪২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১১

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৫

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৮

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৪

৪৬. জায়সী ও আলাওল, পদ্মাবতী, সম্পাদনা দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আগষ্ট ২০০৯) পৃষ্ঠা ১০

৪৭. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮৩

৪৮. আলাওল, পদ্মাবতী, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ফেব্রুয়ারি ২০০২), পৃষ্ঠা ২১২

৪৯. জায়সী, পদ্মাবতী, পৃষ্ঠা ১৮১

৫০. আলাওল, পদ্মাবতী, পৃষ্ঠা ২১২

৫১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২৯

৫২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২৯

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩১

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৮

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৮

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৯

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩২৩

৫৮. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৯৮

৫৯. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, এপ্রিল ২০০১), পৃষ্ঠা ১৫৫

৬০. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৮

৬১. কোরেশী মাগন ঠাকুর বিরচিত চন্দ্রাবতী, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, (ঢাকা : সূচীপত্র, ডিসেম্বর, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৩৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

অষ্টাদশ শতকের মুসলিম কবির কাব্যে নারী

সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিদের যে প্রভাব বাংলা সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়, অষ্টাদশ শতকে তা সম্পূর্ণরূপে স্তিমিত হয়ে পড়ে। এই শতকে দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওলের মতো শক্তিশালী কোনো কবির সন্ধান পাওয়া যায় না। রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান-এর সাহিত্যধারাটিও খুবই ক্ষীণ হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতাও এর পিছনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। একদিকে পর্তুগীজ জলদস্যুদের ধারাবাহিক অত্যাচার অন্যদিকে আসন্ন ইংরেজ শাসন সমাজ জীবনে এক বিপন্নতা সৃষ্টি করেছিল। আরাকান রাজ্যের বিশৃঙ্খলতার প্রভাবে ঐ রাজসভায় মুসলিম সাহিত্যিকদের সাহিত্য-চর্চা ধীরে ধীরে ব্যাহত হয়।

পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের মুসলিম কবির কাব্যে নারীরা কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের নিরিখে মুসলিম কবিদের কাব্যে নারীর ভূমিকা বর্তমান অধ্যায়ের উপজীব্য বিষয়। এই পর্যালোচনার গভীরে প্রবেশের পূর্বে আমাদের দেখে নেওয়া প্রয়োজন এই শতকে মূলত কি ধরনের লেখার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়।

এই শতকে লেখা অনেকগুলি কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য, পুরাণের অনুবাদ, গীতগোবিন্দের অনুবাদ, চৈতন্য জীবনীকাব্য ও বিভিন্ন কীর্তনগানের সন্ধান পাওয়া যায়। কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের

মধ্যে 'কবিচন্দ্র' শঙ্কর চক্রবর্তীর 'গোবিন্দমঙ্গল' বা 'ভাগবতামৃত', অভিরামদাসের কৃষ্ণমঙ্গল, বলরামদাসের 'কৃষ্ণলীলামৃত', গোপাল সিংহদেবের 'নামহীন কাব্য', ঘনশ্যাম দাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস, দ্বিজ প্রভুরামের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল', দ্বিজ রামেশ্বরের গোবিন্দমঙ্গল ইত্যাদি কাব্যসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই শতকে বিভিন্ন পুরাণের অসংখ্য অনুবাদ হয়েছিল। প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের জন্যই হয়তো হিন্দু কবিরা এবিষয়ে তৎপর হয়েছিলেন। কোচবিহারের রাজ দরবারের অধীনস্থ অনেক সভাপণ্ডিত এসময় পুরাণ অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বলরাম কুণ্ডুর পদ্মপুরাণ, পরমানন্দ শর্মার স্কন্দপুরাণ (কাশীখণ্ড), মহীনাথ শর্মার মার্কণ্ডেয় পুরাণ(দেবী সপ্তশতী), দ্বিজ বৈদ্যনাথের শিবপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, দ্বিজ রামানন্দের নৃসিংহ পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ (স্যমন্তকপুরাণ) ও ধর্মপুরাণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদের কাজেও এই কবিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

বৈষ্ণবশাস্ত্র ও গোস্বামীগ্রন্থগুলিও এই শতাব্দীতে অনূদিত হয়। সাহিত্যিক মূল্য হিসেবে সংক্ষেপে রচিত এই গ্রন্থগুলির মর্যাদা বিশেষ না থাকলেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় লিপিবদ্ধ করার মতো যোগ্যতা এই কাব্যগুলির প্রাপ্য। গিরিধর দাস, রসময় দাস ও দ্বিজ প্রাণকৃষ্ণ কবি জয়দেবের লেখা গীতগোবিন্দের অনুবাদ করেছিলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর এক শিষ্য কৃষ্ণদাস 'চমৎকারচণ্ডিকা', 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু', 'উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ', মাধুর্যকাদম্বিনী, রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা প্রভৃতি অনুবাদ করেছিলেন।

এছাড়া অনেক লেখক ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির অনুবাদ কার্যে এই সময় এগিয়ে এসেছিলেন। প্রবোধানন্দ সরস্বতীর চৈতন্যচন্দ্রামৃত কাব্যটিরও অনুবাদ এসময় করা হয়েছিল। অনেক সময় যাঁরা এইসব অনুবাদ কর্ম সম্পাদন করেছিলেন অজ্ঞাত কারণে তাদের নাম জানা যায়নি।

অষ্টাদশ শতকে রচিত হিন্দু কবিদের কাব্যে নারীদের অবস্থান যদিও এই অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়, তবুও কতিপয় দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে আমরা এই শতকের কাব্যে নারীপ্রকৃতি কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা দেখার প্রচেষ্টা করব।

এই শতকে প্রাপ্ত শতঞ্জীব দাসের 'দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড' রচনার শেষের ভণিতায় পাওয়া যায় —

''আয়ান বলেন শুন নন্দনন্দন হরি
তোমার প্রসাদে রক্ষা পাইল মোর নারী।
এত কহি আয়ান রাধাকে লঞা যায়
শতঞ্জীব দাস পিছে পিছে গোড়ায়।''[১]

(পুথির লিপিসমাপ্তিকাল ১৭৭২ অব্দ, পৃষ্ঠা-৩১৫, সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড)

একজন নারীর নিরাপত্তা বা দায়-দায়িত্ব নেবার ভার যে সামাজিক নিয়ম অনুসারে একজন পুরুষই বহন করে তার প্রমাণ এই কাব্যছত্রে বর্তমান। কখনও বা 'সমাজস্বীকৃত' স্বামীই অপর একজন পুরুষের কাছে (নন্দনন্দন হরি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) অকপটে তা স্বীকার করতে দ্বিধা করে না। প্রাপ্তবয়স্ক নারীর 'অভিভাবক' রূপে তাই সবসময় নানাবিধ শর্তেই একজন পুরুষের নাম উঠে আসে তা সে পিতা / স্বামী / পরপুরুষ যেই হোক না কেন!

এই শতকের মধ্যভাগে সংকলিত — 'সংকীর্তনামৃত' গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা দীনবন্ধুর একটি পদেও দেখতে পাওয়া যায় দূতী, রাধার প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের নিকট যাত্রা করেছে।

''চলল দূতী কুঞ্জর জিতি মন্থরগতি-গামিনী
খঞ্জন দিঠি অঞ্জন মিঠি চঞ্চলমতি-চাহনী।
জঙ্গলতট পন্থ নিকট আসি দেখিল গোপিনী
গোপ সঙ্গে শ্যাম রঙ্গে গোঠে করল সাজনি।
না-পাঞা বিরল আঁখি ছলছল ভাবিয়া আকুল গোপিকা
নাথ রমণ দরশন বিনু কৈছে জিয়ব রাধিকা।
যামুন-কূল চম্পকমূল তাহে বসিল নাগরী
দীনবন্ধু পড়ল ধন্ধ হইল বিপদ - পাগলী।।''[২]

(অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ও

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত

(১৩৩৬ সাল) পুথির লিপিকাল -

১৭৭৩) পৃষ্ঠা - ৩৫১, সুকুমার সেন

- প্রাগুক্ত)

এখানেও দেখা যায় দূতী অত্যন্ত বিচলিত, রাধার বিরহাতুর করুণ অবস্থার কথা ভেবে। পূর্বে উল্লিখিত পদটির মতো প্রত্যক্ষ নিরাপত্তা রক্ষার কথা এখানে না থাকলেও পুরুষের প্রতি মানসিক আবেগ প্রবণতাবশতঃ নারীর হৃদয়বিদারক অবস্থার কথা এখানে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। একজন নারীই (দূতী) তা যেন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে উঠেছে, আরেকজন নারীর মানসিক বিহ্বলতাকে অনুমান করতে পেরে। এই শতকে এটাই যেন ছিল নারীর চিরায়ত রূপ। তাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারেননি হিন্দু কবিরা।

এই শতকেরই প্রথম দিকের একজন কবি নটবরদাসের একটি পদে দেখা যায় —

''সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল সম্বরণ নাহি কর
বসি থাকি থাকি উঠহ চমকি ভূষণ খসাঞা পর।
বয়সে কিশোরী রাজার ঝিয়ারি তাহে কুলবধূ বালা
কিবা অভিলাষ বাড়ায়ে লালস না বুঝি তোমার ছলা।''[৩]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৩৫৩)

এখানেও নায়কের জন্য নায়িকার বিরহে বিহ্বল রূপটিই পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে। নারীর

পুরুষের প্রতি নির্ভরশীলতা অষ্টাদশ শতকের প্রেক্ষিতে একটি অতি পরিচিত দৃশ্য-একথা স্বীকার করতেই হবে।

আমরা এতক্ষণ হিন্দু কবিদের লেখা কাব্যাংশের দৃষ্টান্ত দিয়েছি। এবার অষ্টাদশ শতকের মুসলিম কবিদের কাব্যে নারী চরিত্রদের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা করব। অধ্যায়ের সূচনাতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষক মুসলমান কবিদের প্রতিপত্তি এই শতকে ক্রমহ্রাসমান। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার প্রভাবে মুসলিম কবিদের কাব্যরচনার ঐতিহ্য এসময় কিছুটা হলেও ব্যাহত হয়।

সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে অথবা অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে নওয়াজিস খানের রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। ওয়াকিল আহমদ রচিত 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' নামক গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ থেকে জানতে পারা যায় যে, নওয়াজিস খানের লেখা অনেকগুলি কাব্য পাওয়া যায়। গুলে বকাওলী, বয়ানাত, গীতাবলী, প্রক্ষিপ্ত কবিতা, জোরওয়ার সিংহ কীর্তি, পাঠান প্রশংসা প্রভৃতি রচনা এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

এই কবির পূর্বপুরুষ চট্টগ্রামের নিকটবর্তী স্থান 'ছিলিমপুর' এর বাসিন্দা ছিলেন, কবির পিতা ছিলিম খানই এই গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। পীর মৌলভী আতাউল্লা ছিলেন নওয়াজিস খানের দীক্ষাগুরু। এঁর মাধ্যমেই কবি সুফীধর্মে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাঁর কাব্য 'গুলে বকাওলী'র হামদ ও না'ত অংশে পাওয়া যায়।

''প্রথমে প্রণমি নিরঞ্জন কোটিবার।

বিন্দু হোন্তে জেবা স্রিজিলেক এ সংসার।।

সোর্গ আদি নাগপুর কিবা নর দেবা।

নানা ভাতি মতে লএ এ সবের সেবা।।

আপনার মিত্র নিআ আসে নিজ পাস।

নিজ রূপ যুতি করিয়া প্রকাশ।।

এক সিঙ্গাসনে দোহে বসি এক রঙ্গে।

ভেদ ব্যক্ত করে জেবা নিজ মিত্র সঙ্গে।।

মৈত্যহো হোন্তে নিমেসে আসে নিআ তানে।

চন্দ্র তুই খণ্ড করে মিত্রকুল সনে।।''[৪]

(গুলে বকাওলী, পৃ-১০৫)

সুফীতত্ত্বের আভাস কাব্যের এই অংশে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। কেবলমাত্র 'গুলে বকাওলী' কাব্যেই নয়, সুফীবাদের নিদর্শন নওয়াজিস খানের লেখা গীতাবলী ও বয়ানাতেও পাওয়া যায়।

তাঁর 'গুলে বকাওলী' কাব্যটি অন্যান্য রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান অপেক্ষা অনেকাংশে রোমান্সধর্মী। অবাস্তব উপাদানের পরিমাণ এই কাব্যে অনেকটাই বেশী তা কাব্যটির আখ্যান অংশ থেকেই বোধগম্য হয়। তবে একথাও সত্য যে এই কাব্য বাস্তবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা

করতে পারেনি। তখনকার সামাজিক আচার-আচরণ বিধি নিষেধ ঘটনা-পারস্পর্যেই কাব্য-কাঠামোয় স্থান পেয়েছে এবং সেখান থেকেই কাব্যে নারীর অবস্থানের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। তাজুলমুলুক ও বকাওলীর বিবাহকার্য সম্পন্ন হবার পর বকাওলীর পিতা ফিরোজ সাহ তাজুলমুলুককে যখন বলে ওঠেন,

''মোর কন্যা স্থাব্যধন দিলুম তোমা হাতে।
প্রেমরসে বন্দী করি রাখিবা জগতে।।''[৫]

(ওয়াকিল আহমদ, পৃষ্ঠা ৩৪০)

তখন বুঝতে পারা যায় কন্যা সম্প্রদানের মতো সামাজিক রীতি সম্ভবত হিন্দু ধর্মের প্রভাবে অষ্টাদশ শতকের মুসলিম জগতেও বহুল প্রচলিত ছিল। তাই কাব্যে তার ছায়া এসে পড়েছে।

এছাড়াও ঘুমন্ত অবস্থায় নায়িকাকে দেখে নায়কের চিত্ত বিহ্বল হবার ঘটনাও মধ্যযুগের কাব্য কাঠামোর এক চির পরিচিত দৃশ্য। 'গুলে বকাওলী' কাব্যেও দেখা যায় নায়ক তাজুলমুলুক ঘুমন্ত বকাওলীকে দেখে প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েছে। এক মনোহর টঙ্গিতে নিদ্রাভিভূতা পরীকন্যাকে দেখে তাজুলমুলুকের অন্তরে প্রেমভাব জাগ্রত হয়।

''চাহিতে চাহিতে রূপ মুহিত বিশেষ।
প্রেমালাপ আক্ষি পন্তে হইল প্রবেশ।।
হ্রিদেত তরঙ্গ হইল সেই প্রেমানল।
দহএ সমস্ত অঙ্গ না হয় শীতল''।।[৬]

(ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত,
পৃষ্ঠা-৩৩৯)

সৈয়দ হামজা রচিত মনোহর মধুমালতী কাব্যেও সমতুল্য দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কাব্যের নায়ক মনোহর নায়িকাকে দেখতে পায়,

''সুবর্ণের খাটে দেখে শুয়ে এক নারী।
নবীনা যুবতী ধনি রূপের মাধুরী।।
পড়িছে মাথার ধনি রূপের মাধুরী।।
পড়িছে মাথার কেশ সুন্দর বদনে।
ভ্রমরা গুঞ্জরে তার অঙ্গের বসনে।।
মনোহর ভাবে মনে না জানি কে হয়।
ইন্দ্রের কামিনী কিবা মুনির তনয়।। ''[৭]

(পৃষ্ঠা - ২৪৮, মধ্যযুগের কাব্য
সংগ্রহ আহমদ শরীফ সম্পাদিত)

নারীকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে পুরুষের তার প্রতি সৌন্দর্য লালসা বা কামলালসা বৃদ্ধি পাবার ঘটনা মধ্যযুগের অনেক কাব্যেই বারবার ঘুরে ফিরে আসে। অষ্টাদশ শতকে রচিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের 'বিদ্যাসুন্দর' অংশের 'দিবাবিহার ও মানভঙ্গ' অধ্যায়ে দেখতে পাওয়া যায়,

''দুয়ারে কপাট দিয়া বিদ্যা আছে ঘুমাইয়া
দেখিয়া সুন্দর আনন্দিত।।

রজনীর জাগরণে নিদ্রা যায় অচেতনে

সখীগণ ঘুমায় বাহিরে।

দিবসে ভুঞ্জিতে রতি সুন্দর চঞ্চলমতি

অলি কি পদ্মিনী পাইলে ফিরে।।

মত্ত হৈলা যুবরাজ জাগিতে না সহে ব্যাজ

আরম্ভিলা মদনের যাগ।”[৮]

(অন্নদামঙ্গল কাব্য, পৃষ্ঠা - ২৮৩)

উপরিউক্ত তিনটি কাব্য - দৃষ্টান্তেই আমরা ঘুমন্ত নায়িকার প্রতি নায়কের সৌন্দর্য বা কামলিপ্সার পরিচয় পাই। কাব্যরচনার ক্ষেত্রে কবিদের রসনিষ্পত্তির বিষয়টি পাশে সরিয়ে রেখে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যদি ভাবা যায়, ঘুমন্ত নারী অর্থাৎ সে নিষ্ক্রিয়, কোনোরকম সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে সে অপারঙ্গম। নারীর শক্তিহীনতার কথা অলঙ্কৃত উপায়ে ব্যক্ত করাই কি আঠারো শতকের কাব্যগুলির উদ্দেশ্য ছিল? নাকি সমাজের এই গতানুগতিক অভ্যস্ততার সাহিত্যিক প্রতিফলন বারবার ঘটেছে কাব্যগুলিতে? কাব্যের নারী চরিত্ররা যে কখনও এ ব্যাপারটির প্রতিবাদ করেনি এমনটা নয়। ‘বিদ্যাসুন্দর’ এই দেখতে পাওয়া যায়, বিদ্যা খুব ভালোভাবে গ্রহণ করেনি সুন্দরের কাম-প্রগলভ আচরণকে। বিদ্যাকে অকপটে বলতে শোনা যায়,

‘‘দিবসে নিদ্রার ঘোরে আলুথালু পেয়ে মোরে

এ কর্ম্ম কেবল অপমান।।

ঘৃণা লজ্জা দয়া ধর্ম্ম নাহি বুঝে মর্ম্ম কর্ম্ম

নিদারুণ পুরুষের মন।

এত ভাবি মনোদুখে মৌন হয়ে হেঁটমুখে

ত্যাজে হার কুণ্ডল কঙ্কণ।।"[৯]

(ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য

পৃষ্ঠা-২৮৪)

অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর তাঁর যুগানুপাতে আধুনিক চিন্তা-চেতনার অধিকারী ছিলেন। প্রথাসিদ্ধ অনেক কিছুকেই তাই তিনি কাব্যে স্থান দিয়েও প্রথার বাইরে এসে বিদ্যার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরকে গুরুত্ব দিতে পিছপা হননি। একজন স্বাধীন নারীচরিত্র কোনো অবস্থাতেই যে নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, তা কবি আঠারো শতকের হলেও খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আর তার প্রকাশই ঘটেছে তাঁর কাব্যে।

অন্যদিকে নওয়াজিস খান রচিত গুলে বকাওলী কাব্যেও দেখতে পাওয়া যায় ঘুমন্ত বকাওলীর সঙ্গে তাজুলমুলুক অঙ্গুরী বিনিময় করে ও প্রেমপত্র লিখে তার আঁচলে বেঁধে দেয়। পত্রে তাজুলমুলুক লেখে,

''প্রাণ আদি শক্তি মতি রাখি তোমা সঙ্গে।

মৃত্যুবৎ চলি যাই নিজ শূন্য অঙ্গে।।"

(বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান,

উপাদান, পৃষ্ঠা-৩৩৯)

ঘুম থেকে উঠে বকাওলী অঙ্গুরী ও প্রেমপত্র পেয়ে সওদাগরের ছদ্মবেশে গিয়ে তাজুলমুলুকের পরিচয় জানতে চায়। বকাওলী ছিল পরীকন্যা। তাজুলের এই আচরণে সে ক্ষুব্ধ হয় না। হেমালা দৈত্যের সহায়তায় তাজুলমুলুকের সঙ্গে বকাওলীর মিলন হয়। বিদ্যাসুন্দর এর বিদ্যার মতো বকাওলী তাজুলমুলুকের এহেন আচরণে অপমানিত বোধ করে না। এই কাব্যে বকাওলীর মা জামিলা খাতুনের কণ্ঠস্বর বরং উল্লেখ করার মতো। পরীকন্যাকে মানবপুত্রের সঙ্গে দেখে জমিলার প্রতিক্রিয়া উল্লেখযোগ্য।

''বহুল প্রকার বাক্য লাগিল গর্জিতে।

সাঁচনি হইছে প্রেম মানব সহিতে।। ...

মানবের সঙ্গে ওই প্রেম বারাইলি।

গন্দ্রব্য মহিমা যথ এক না রাখিলি।।''[১১]

(বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান -

ওয়াকিল আহমদ, পৃষ্ঠা - ৩৩৯)

শুধু বাক্যবাণে বিদ্ধ করেই জমিলা খাতুন ক্ষান্ত থাকেনি, সে তাজুলমুলুককে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে। গুলে বকাওলী কাব্যটি যদিও অবাস্তব কাহিনী নির্ভর কাব্য, তবু এ ধরণের কাব্যেও বাস্তব রস সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থাকে না। বকাওলীর মাতা জমিলা চরিত্রটি সেদিক থেকে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত বাঙালী চিরাচরিত মাতৃ চরিত্রেরই প্রতিনিধিস্বরূপ হয়ে ওঠে।

এখন প্রশ্ন হল জমিলা খাতুনের চরিত্রটি আমাদের চির পরিচিত মাতৃরূপের প্রতিমূর্তি নাকি সেও হয়ে উঠেছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের একজন প্রতিনিধি? কারণ একাব্যে সবকিছুই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চিহ্ন বহন করে চলে তা আমরা আগেও প্রত্যক্ষ করেছি যখন ফেরোজ সাহা কন্যা বকাওলীকে তাজুলমুলুকের কাছে সমর্পণ করে বলে ওঠে,

''মোর কন্যা স্থাব্যধন দিলুম তোমা হাতে।
প্রেমরসে বন্দী করি রাখিবা জগতে।।''[১২]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৩৪০)

'স্থাব্যধন' শব্দটি কাব্যের কবির মানস চেতনাকে বোধগম্য করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নারীকে 'স্থাব্যধন' হিসেবে ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে তৎকালীন যুগচেতনার প্রবণতা ধরা পড়ে। আবার একথাও ভুলে গেলে চলবে না যে নওয়াজিশ খাঁ-এর এই কাব্যটি তার স্বাধীন চিন্তা-চেতনার দ্বারা রচিত কাব্য নয়। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক রচিত 'মুসলিম বাংলা-সাহিত্য' নামক গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্য পাওয়া যায় যে 'গুল-ই বকাওলী' কাব্যের পুঁথিটি চট্টগ্রামের বাণী-গ্রামের জমিদার বংশের আদি পুরুষ বৈদ্যনাথ রায়ের আদেশে রচিত। কবির আত্মবিবরণীতে তাঁর বংশতালিকা পাওয়া যায় :—

সলীম খাঁ

(ইনি চট্টগ্রামের 'ছিলিমপুর' পরগণার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন)

শরীফ খাঁ

ইবরাহীম খাঁ

মুহম্মদ ইয়ার খাঁ (খোন্দকার)

মুহম্মদ নওয়াজিশ খাঁ (কবি)[১৩]

(মুসলিম বাংলা সাহিত্য - মুহম্মদ,

এনামূল হক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা,

এপ্রিল, ২০০৯, পৃষ্ঠা - ১৩৮)

এই কাব্য নিছক কাহিনী কাব্য। তবে এ প্রসঙ্গে আরও একটি তথ্য জানিয়ে রাখা প্রাসঙ্গিক যে কবি নওয়াজিস খাঁ-এর পীর ছিলেন মৌলভী আতাউল্লা। অর্থাৎ কবি এই পীরের মাধ্যমেই সুফীমতে শিক্ষিত ও দীক্ষিত হয়েছিলেন। এই কাব্যের হামদ ও না'ত অংশে সুফী অধ্যাত্মতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এই কাব্যের কাহিনী উৎস আরব-পারস্যে নয়। হিন্দী ভাষাতেও এই

কাব্য রচিত হয়নি। ওয়াকিল আহমদ রচিত 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' গ্রন্থটিতে এই তথ্য পাওয়া যায় যে, ''এক. অযোধ্যার নবাবের গ্রন্থাগারে ক্যাটালগে স্প্রিংগার সাহেব গুলে বকাওলীর একখানা পাণ্ডুলিপির কথা বলেন। এর রচনাকাল ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ। এটি দাকিনী ভাষায় রচিত। এখন গ্রন্থটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। দুই. মুন্সী নেহালচান্দ লাহোরী জানান যে, তিনি শেখ ইজ্জতুল্লাহর ফারসী তাজুলমুলক গুলে বকাওলীর অনুসরণে উর্দু অনুবাদ করেন। ইজ্জতুল্লাহ বাঙালী ছিলেন, তাঁর কাব্যের রচনাকাল ১৭২২ খ্রীস্টাব্দ। তিনি কোন এক হিন্দী গ্রন্থের অনুসরণ করেন, কিন্তু গ্রন্থখানির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। গুলে বকাওলীর কাহিনী ধারা বাংলাদেশের নয়, এটি মধ্যভারতের হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।''[১৪]

(বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৭২,

পৃষ্ঠা - ৪০)

এই ইজ্জতুল্লাহ-এর থেকে নওয়াজিস খাঁ কাব্যের আখ্যান কাহিনী সংগ্রহ করতে পারেন। আর তার এই কাব্য রচনার জন্য রাজার আদেশ ছিল তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তার সাথে মিশ্রিত হয়েছে পীর মৌলভী আতাউল্লার থেকে প্রাপ্ত সুফী দর্শন ও সুফী অধ্যাত্ম-ভাবনা। এই মিশ্রভাবনায় উদ্বুদ্ধ কবি নওয়াজিস খাঁ তাঁর রচিত কাব্যে যে যুগধর্ম অনুসরণ করবেন, তা যথেষ্ট যুক্তিনিষ্ঠ। গুলে বকাওলী কাব্যের মূল কাহিনীতেও দেখতে পাওয়া যায় যে জ্যোতিষীর গণনানুসারে শর্কস্থানের জয়নুলমুলুকের পুত্র তাজুলমুলুকের বারো বছর বয়স

হলে তার পিতা দৃষ্টিশক্তি হারায়। বকাওলী পরীকন্যার উদ্যান থেকে নেওয়া ফুলের নির্যাস এর মাধ্যমেই তার অন্ধত্ব থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব। সেকারণেই পরীকন্যা বকাওলীর উদ্দেশ্যে তাজুলমুলুকের যাত্রা। এসময়ের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তাজুলমুলুক এক প্রাচীরবেষ্টিত নগরে উপস্থিত হয়ে আইয়ারা নামক এক বেশ্যার সংস্পর্শে আসে। আইয়ারা তার কাছে আত্মসমর্পণ করে বিয়ে করার অনুরোধ জানায়। তাজুলমুলুক তার সঙ্কল্পের কথা জানিয়ে ঐ বেশ্যা আইয়ারাকে বিবাহ করে। বেশ্যাকে বিয়ে করার মতো ঘটনা মধ্যযুগের সাহিত্যে বিরল দৃষ্টান্ত যা এই কাব্যমধ্যে স্থান পেয়েছে। এর পরে তাজুলমুলুক পুনরায় পরীকন্যা বকাওলীর সন্ধানে যাত্রারম্ভ করে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মধ্যযুগের অন্যান্য কবির ন্যায় নওয়াজিস খাঁও নারীর রূপ বর্ণনায় পূর্ব-ঐতিহ্যই অনুসরণ করেন। ঘুমন্ত বকাওলীর বিবরণ তিনি দেন নিম্নরূপ —

''সুবর্ণ মৃণাল ভুজ যুগল সুন্দর।
বলয় সংযোগে দোলএ নিরন্তর।।
বারিজ বিকাশ পাণি চম্পক অঙ্গুল।
মেহেন্দি সংযোগে নখে সুরিন্দ বহুল।।
সুবর্ণের স্তনে জিনি বালার্ক চারু।
কনক কটোরা তাহে যুগল সুমেরু।।

শিখরে ধরিছে কিবা প্রঘন শ্যামল।

নতুন ছত্রধারী রাজা বসিছে যুগল।।

ক্ষীরধর গিরিকুচ হর নামে ধরে।

করপূজা দিবারে কুমারে ইচ্ছা করে।।"[১৫]

(মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম

কবি, আজহার ইসলাম, পৃষ্ঠা -২৪৪)

তাজুলমুলুক প্রথমে বেশ্যা আইয়ারাকে বিবাহ করে, পরবর্তী সময়ে সে ঘুমন্ত পরীকন্যা বকাওলীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয় এবং তারও পরে সিংহলরাজ চন্দ্রসেনের কন্যা চিত্রাবতীকেও সে পত্নীরূপে গ্রহণ করে। পুরুষের বহুবিবাহ সমাজস্বীকৃত ছিল, তার পরিচয়ই বহন করে এ কাব্য। নওয়াজিস খাঁ তার ব্যতিক্রম ঘটাননি।

অষ্টাদশ শতকে রচিত এমন অনেক মুসলিম কবির কাব্যের সন্ধানই পাওয়া যায় যারা রোমান্টিক কাব্য রচনা করেন। তাঁদের কাব্যে প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়ে নারী চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক। এ প্রসঙ্গে শ্রী প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, ''মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিদিগকে এক নতুন সাহিত্যিক যুগের স্রষ্টা বলিয়া অভিহিত করিলে কিছুমাত্র অন্যায় হয় না, কেননা, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে পরবর্তীকালে আরও মুসলিম কবি এমনকি হিন্দু কবিও মুসলিম রোমান্টিক কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন তার প্রমাণ আছে।"[১৬]

(সাহিত্য প্রবেশিকা, প্রথম খণ্ড,

ভূমিকা, সম্পাদক শ্রী প্রবোধচন্দ্র

বাগচী, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা-১)

বাংলা রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান ছাড়াও ধর্মবিষয়ক কাব্যও রচনা করেন মুসলিম কবিরা। শুধুমাত্র আঠারো শতকে নয়, ষোড়শ শতকেও এধরণের কাব্যের পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন কবি সাবিরিদ খানের 'রসুল বিজয়', 'মোহাম্মদ হানিফা ও কয়রাপরী', শেফ ফয়জুল্লা রচিত 'গাযী বিজএ', 'গোরক্ষ বিজএ', জয়নালের চৌতিশা প্রভৃতি ধর্ম বিষয়ক কাব্য। সত্যপীর, মাণিকপীর, একদিল শাহ্‌কে নিয়ে রচিত কাব্যগুলিতে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সমন্বয় ভাব প্রকাশিত হয়। মুহম্মদ এনামুল হক এই জাতীয় কাব্যকে 'সাংস্কৃতিক সমন্বয় সঞ্জাতকাব্য' বলে অভিহিত করেছেন।[২৭]

(প্রসঙ্গসূত্র --- মুসলিম বাংলা

সাহিত্য --- ডক্টর এনামূল হক,

পৃষ্ঠা -১১১)

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন আমাদের দেশে গাজীপীরের কাহিনী সম্বলিত কাব্যের এক সুবিন্যস্ত ঐতিহ্য বর্তমান। তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী সময় থেকেই এদেশে বিভিন্ন পীর দরবেশ ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। তাদের হাত ধরেই আমাদের দেশে প্রবেশ করে গাযীপীরদের নানাবিধ যুদ্ধ অভিযানের কাহিনী। খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন, দক্ষিণ

২৪ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে দক্ষিণ রায়, বনবিবি, বড় খাঁ গাজী, কালুপীর প্রভৃতি লৌকিক দেবতাকে পূজা করার প্রচলন ছিল। সাপ ও বাঘের ভয় থেকেই এসব পূজার উদ্ভব হয়। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় যথার্থই বলেছেন,

> ''আদিম বাঙালীর সর্প ও ব্যাঘ্রভীতি সুবিদিত এবং এই দুইটি প্রাণী ভয় দেখাইয়া কী করিয়া পূজা আদায় করিয়াছিল এখন আর অবিদিত নয়। মধ্যযুগে মনসাপূজা এবং দক্ষিণ রায় বা ব্যাঘ্রপূজার বিস্তৃত প্রচলন এই দুইটি প্রাণী হইতেই।''[১৮]
>
> (বাঙ্গালীর ইতিহাস, ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়, আদিপর্ব, পৃষ্ঠা-৬০৬)

গাজী কাহিনীর মূল কাহিনী যাকে নিয়ে আবর্তিত হয় তিনি হলেন গাজী পীর বা বড় খাঁ গাজী। হিন্দুদের ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের সমতুল্য হলেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের এই গাজী পীর।

আঠারো শতকের শেষভাগে (১৮৯৮-৯৯ খ্রীস্টাব্দে) শেখ খোদা বখ্‌শ নামে এক কবি ৫৮ পালায় রচনা করেন 'গাজী কালু ও চম্পাবতী কাব্য।' ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও এই কাব্য অনুধাবন করলে তৎকালীন নারীর অবস্থান সম্পর্কে অল্পবিস্তর ধারণা পাওয়া যায়।

পশ্চিম দেশের বিরাট রাজ্যের বাদশা শাহ সেকন্দর ওসমা সুন্দরীকে বিবাহ করে।

ত্রিপদী ছন্দে কবি তার বর্ণনা করেছেন,

''ওসমাক বিভা করি আইল বাদশা নিজ পুরী

দেখিতে সুন্দর বড় অতি।

বৈরাটের যত নারী আইল সব সারি সারি

বস্ত্র আদি পরে নানা জাতি।।

দেখিয়া ওসমার অঙ্গ নারী সব মন ভঙ্গ

নারীরূপে নারী মূর্ছাগত।

বাঘের কামান জিনি দুই ভুরুর খিঁচনি

ললাটে চন্দ্র কত শত।।

বাহু মৃণাল জিনি মোলাম হস্ত খানি

নাভি পদ্ম কাম সরোবর।

কুচ ডালিম্ব শোভা চক্ষু যেন পুষ্প জবা

রঙ্ যেন গগনের ভাস্কর।

কাল সর্প জিনি চুল দেখি চিএ অলিকূল

নাসিকা দেখিতে সুরভিত।

কেশরী কাঁকলি অতি দশন উজ্জ্বল মতি

মুখ যেন কাঞ্চন মোহিত।।

পদ্ম পত্র জিনি কর্ণ দেহে যেন অগ্নি বর্ণ

দশন খঞ্জন অভরণ।

খোদা বখ্‌শে কহে বাণী অঙ্গ রূপ কিবা জানি

অলঙ্কারের শুন বিবরণ।।"[১৯]

(বাংলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, দিব্য প্রকাশ, ২০০৮, পৃষ্ঠা ১৫৫)

ধর্ম প্রচারার্থে এই কাব্য রচিত হলেও ওসমা বিবির রূপ বর্ণনায় কবি খোদা বখ্‌শ অতি যত্নসহকারে ব্যতিরেক অলঙ্কারের সার্থক ব্যবহার করে কাব্যের এই অংশ রচনা করেছেন।

শুধুমাত্র এখানেই নয়, চম্পাবতীর রূপ-বর্ণনার ক্ষেত্রেও কবি ব্যতিরেক অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

''কতেক কহিব তার রূপের সিঙ্গার।

রূপে গুণে পারে সেই সংসার মজাইবার।।

শীশের সিন্দুর যেন মুকতার ঝারা।

দুই চক্ষু জ্বলে যেন স্বরগের তারা।।

নাসিকার গঠন যেন কানায়ার হাতের বাঁশি।

জগত মোহিত করে চন্দ্র মুখের হাসি।।

ডালিম্ব জিনিঞা স্তন উষ্ণ পএধর।

উত্তম কাঁচুলি শোভে তাহার উপর।।

বচন শুনিতে তার কি কহিব আমি।

কতেক কহিব তার রূপের গাঁথনি।।"[২০]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ২৬৯)

নারীর রূপ বর্ণনার সমান্তরালে কবি যদিও শিশু গাজী ও পরিণত বয়স্ক গাজী কালুর রূপেরও বিবরণ দিয়েছেন তা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক। তবে একথা বলে রাখা অত্যন্ত আবশ্যক যে কবি অসাধারণ দক্ষতার প্রয়োগে উৎপ্রেক্ষা ও ব্যতিরেক অলংকারের মাধ্যমে নারীর রূপ বর্ণনার মনোগ্রাহী পরিচয় দিয়েছেন।

এছাড়াও তার কাব্যে নারীর অবস্থানের ভিন্নমাত্রিক কৌশলও ইতস্ততভাবে বিন্যস্ত হয়ে আছে। যেমন চম্পাবতীকে পাহারা দেবার জন্য যে বন্দোবস্ত ছিল তা কবি নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেছেন —

"যে ঘরে থাকেন কন্যা চম্পাসুন্দরী।

ঘর বেড়ি থাকে এক লক্ষ পহরী।।

একাশ্বর থাকে কন্যা কেহ নাহি সাথ।

মাও পুষ্পবতী কেবল রান্ধিয়া দেএ ভাত।।"[২১]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ২৬৯)

ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যে একাব্য রচিত তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দু-মুসলিম দুই ধর্মের সমন্বয় সঞ্জাত কাব্য হলেও সুফী ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব এ কাব্যে বর্তমান। ২৪ সংখ্যক পালায় দেখতে পাওয়া যায় —

''আল্লা আল্লা বল ভাই দম কর মাদার।

অধমে লাগিছে তোমার কালাম জপিবার।।

ফারসী নাগরী পড়ে আরবী কালাম।

পড়িল ছত্রিশ অক্ষর গুরুর ষোল নাম।।"[২২]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৭৩)

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়া থেকে পীর-দরবেশরা বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। উত্তর ভারতে কিয়ৎকাল অবস্থানের পরে তাঁরা বাংলায় আসেন। সোহরাওয়ার্দী, চিশতী, আধামী, নকশবন্দী, ক্বাদিরী, কলন্দরী, মাদারিয়া প্রভৃতি নানাবিধ শাখার সুফীদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারা যায়। এখানেও 'দম কর মাদার' বলতে মাদারিয়া খান্দানের সুফী সম্প্রদায়কেই বোঝানো হয়েছে। মাদারিয়া শাখার আদি প্রবক্তা ছিলেন সিরিয়ার বাসিন্দা আবু-ইসহাকের পুত্র বদিউদ্দীন শাহ মাদার। কথিত আছে তাঁরই এক শিষ্য শাহ

আল্লাহ বাংলাদেশে মাদারিয়া সুফীমত প্রচার করেন। শূন্য পুরাণে দম মাদারের উল্লেখ থাকলেও এই শাখার প্রভাব সপ্তদশ শতকের পূর্বে এদেশে ছিল না।

এতগুলি তথ্যপ্রদানের উদ্দেশ্য একটাই যে কবি খোদা বখসের কাব্যে নারীর অবস্থান বোঝার ক্ষেত্রেও কাব্যরচনার পশ্চাদপটকে বুঝে রাখা প্রাসঙ্গিক।

পুনরায় কাব্য-অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেখা যায় যে কবি খোদা বখস্ নারীর রূপ-বর্ণনা করেই শুধু ক্ষান্ত হননি, তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী নারীর অলঙ্কারেরও বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে তাঁর রচনা চাতুর্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিরাট নগরের অধিপতি শাহ সেকন্দরের বিবির অলঙ্কার কবি বিশদে বিবৃত করেছেন,

‘‘নাকের বেসরি ঝলমল করি
মোড়া করে নিত্য মালি।।
গলাতে হাঁসুলি পায়েতে পাসুলি
পৃষ্টেত নোটন দোলে।
মাণিকের অঙ্গুরি নক্ষে শোভা করি
গলাতে ঝুলনা ঝুলে।।
হিয়াতে মালতী গলে গজমতি
চরণে নেপুর বাজে।
নঞানে কাজল ভুবন উজ্জ্বল

কপালে রত্ন সাজে।।

হেমতাড় হাতে বাহু শোভে তাতে

বাযুবন্ধ তাহে শোভা।

অনুট গুঞ্জরি শোভে সারি সারি

মাধবী মালতী জবা।।

কিঙ্কিনী কমরে ফণী মণি ধরে

গলে নবলক্ষ হার।

কমলে কিঙ্কির কমরে জিঞ্জির

পবিত্রা চন্দ্রহারা।।

চুটি অঙ্গস্থান বিধিত নির্মাণ

কর্ণে শোভে পিনতারা।

বাক ভূত মাল জুড়াই নয়ান

চন্দ্র সূর্য যেন ঝারা।।

চূড়াএ লোটন খঞ্জন গমন

চলিতে কিঙ্কিনী হালে।

যত নারীগণ হৈল অচেতন

হাত দিয়া বৈসে গালে।।”[২৩]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৫৬)

কবির এই পুঙ্খনাপুঙ্খ অলঙ্কার বর্ণনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় নারীজাতির ভূষণ সম্পর্কে তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ছিল। আবার তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কেও কবি ছিলেন ওয়াকিবহাল। তাই সুবর্ণের কলস নিয়ে ব্রাহ্মণ নারী যখন চলে, তা দেখে পুরুষের অবস্থা কি হয় তা লিপিবদ্ধ করতেও কবি দ্বিধা করেননি —

''দেখিয়া পুরুষের মন স্থির নহে জীবন

কামবাণে দগ্ধেন শরীর।''[২৪]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৭৪)

কিম্বা অন্যভাবেও তিনি ব্যক্ত করেছেন —

''চলিল ব্রাহ্মণী সব নানান থেকারে।

অঙ্গে না ধরে রূপ উড়ে শূন্যকারে।।

রস বেশ প্রীতিভাব কেহ নএ কম।

মদন পাগল সবে পুরুষের যম।।

একেত সুবর্ণ জাঙ্গাল করে ঝলমল।

নারীগণ উপরে তার অধিক উজ্জ্বল।।''[২৫]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৭৫)

আবার অন্যদিকে সেকান্দার বাদশা ও ওসমা বিবির পুত্র জুলহাউসের রূপ মাধুর্যে অনেক

নারী কিভাবে মোহিত হয়ে অকপটে তা প্রকাশ করে, নারীর কণ্ঠস্বরকে শোনার জন্য আঠারো শতকের প্রেক্ষিতে তা প্রশংসার যোগ্য।

''দেখিয়া হাউসের রূপ যত বিদ্যাধরি।

চক্ষেতে লাগিল তালি যতেক সুন্দরী।।

.....

একজন উঠিয়া বলে আর নারীর কাছে।

তোরা কেমন চন্দ্র বল হস্তপদ আছে।।

তাহা শুনি নিরখিয়া দেখে সব নারী।

চন্দ্রহরা নহে বহিন দেখো ভুজধারী।।''[২৬]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৫)

এভাবে নারী কণ্ঠের পুরুষের রূপ বর্ণনার দীর্ঘ কথোপকথন শুনতে পাওয়া যায়। শুধু কথাই নয়, তাদের কার্যকারণ গতিবিধিতেও জুলহাউসের রূপের মুগ্ধতা রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করে।

''এহি বলি যত নারী লড় দিয়া হাঁটে।

প্রবেশ হইল গিয়া সরোবরের ঘাটে।।

বস্ত্র সহিত সব নারী পড়ে ঝম্পদিয়া।

শীঘ্র করি উঠে সবে তিন ডুব দিয়া।।

হাউসেক দেখিয়া সবার স্থির নহে মন।

মনেত না আইসে নাম ভুলিল তর্পন।।

নাম তর্পণ জ্ঞান ধ্যান মনে না আইল।

মিথ্যা মিথ্যা নাম জপি উপরে উঠিল।।"[২৭]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৬)

কিম্বা কাব্যে মালিনী নামক এক চরিত্র অকপটে জুলহাউসকে বলে ওঠে,

''কোন রাজ্যে থাক বাবু কাহার নন্দন।।

কোন নারীর সঙ্গে কিবা মজিয়াছে মন।

মোর কাছে সত্য করি কহ বিবরণ।।

এথাতে আসিয়াছ সেই নারীর আশে।

গিয়াছে বাপ ঘরে তুমি পরবাসে।"[২৮]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৭)

এহেন স্পষ্ট উচ্চারণে নারীসুলভ লজ্জা বা কুণ্ঠাবোধ নেই। এর পরবর্তী অংশেও দেখা যায় মালিনী যথার্থ দূতীর কার্য নির্বাহ করে যার মধ্যে যেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বড়াই কিম্বা সপ্তদশ শতকের সতীময়না কাব্যের দূতী মালিনীর প্রতিচ্ছায়া পরিলক্ষিত হয়।

আবার বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব ধরা পড়ে যখন পাঁচতোলা রাণী বিলাপ করে —

‘‘উঠ উঠ প্রাণনাথ দেখা দেহ মোর সাথ

কোথা গেলে আমাকে ছাড়িয়া।

এত সঙ্কট তরাইলা অগ্নিকুণ্ডে মরি গেলা

আমি রব কার পানে চায়া।।

.....

অল্প বএসের বেলা মদনের বিষম জ্বালা

দেখিয়া তোমার বিড়ম্বন।।

কলসি বান্ধিয়া গলে মরিব জবুনার জলে

কি দেখিয়া বিসরিব ঘরে।।

বুকে পৃষ্ঠে ঘাও মারে কান্দে কন্যা উচ্চৈঃস্বরে

ক্ষণে ক্ষণে জাএ গড়াগড়ি।’’[২৯]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ২০১)

আবার বিবাহ অনুষ্ঠানে নর্তকী, বেশ্যা আনা হত, তার প্রমাণও কাব্যে পাওয়া যায় —

‘‘নর্তকী বেশ্যা যদি ছিল যত জন।

ইনাম দক্ষিণা পায়া করিল গমন।।’’[৩০]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ২০৭)

এ থেকে বোঝা যায় তখনকার সমাজে বারবণিতা ও বেশ্যা উঁচু সমাজের আনন্দ অনুষ্ঠানেও

নিয়ে আসা হত। একে বিনোদনের অঙ্গ হিসেবেই গণ্য করার প্রথা চালু ছিল।

অন্যদিকে কাব্যের ১০ সংখ্যক পালায় ঘটনা প্রেক্ষিতে উল্লিখিত নারী সম্পর্কিত কিয়দংশের প্রতি আলোকপাত করা যেতে পারে।

''ছাড় ভাই ছাড় তোমরা নারীর বেপার।

নারীকে বহাল রাখি নিজে জাও যম ঘর।।

নারীকে জান ভাই মহাকালের ফল।

ভিতরে কুচিত কাল উপরে উজ্জ্বল।।

লোভেত ভুলিয়া আছ নারীর মায়ায়।

জ্ঞান চিত্তে বুঝিয়া দেখ হএ কিনা হএ।।

নারী হয় বাঘের মূর্তি সিংহীর আকার।

সর্বঅঙ্গ খাইয়া ভাই মুণ্ড হইবে সার।।

কতই লেখিব ভাই জ্ঞান চিত্তের কথা।

নারীর কারণে কাহার কি অবস্থা।।''[৩১]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ২০৯)

গাজী পীরের মহিমা কীর্তন করাই ছিল এজাতীয় কাব্যের মূল উপজীব্য, তাহলে ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতেও কি নারী সম্পর্কে এহেন পংক্তিসমূহের বিবরণ কাব্যে অনিবার্য ছিল? নাকি কবি যুগ চাহিদাকে পরিতুষ্ট করার জন্যই এধরণের ধারণার কাব্যিক রূপ দিয়েছেন? প্রশ্ন

থেকেই যায়।

খোদা বখসের মতো আরেক কবির নাম পাওয়া যায় - তিনি হলেন হালুমীর। অনুমান করা হয় অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে তিনি 'বড়খাঁ গাজীর কেরামতি' নামক এক কাব্য রচনা করেন। এই হালুমীর বা হালুমিঞা তাঁর নিজের নাম ব্যতীত আর কোনো আত্মপরিচয় বিবৃত করেননি। ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে এই কবির কথা উল্লেখ করেছেন।[৩২]

(পৃষ্ঠা - ৭৩)

হালুমীরের গাজী কাহিনী ২৯ টি পালায় বিন্যস্ত। তাঁর কাব্যের আখ্যান ভাগ পূর্বালোচিত খোদা বখসের গাজী কাহিনী সম্বলিত কাব্যের সমতুল্য। তাই বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে তাঁর কাব্যে নারীর অবস্থান সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করব।

অনেকেই হালুমীরের কাহিনীকে খোদা বখসের কাহিনীর অনুকরণ বলে থাকেন। খোদা বখসের কাব্যের উপকাহিনীগুলি শুধুমাত্র হালুমীরের কাব্যে নেই। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুই কাব্যের মিল পাওয়া যায়। কাহিনীর দিক থেকেই শুধু নয়, ভাষাগত দিক থেকেও এই দুই কাব্যের সাদৃশ্য লক্ষ করার মতো। হালুমীরের কাব্যেও উসমাবিবির রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে কবিকে বলতে শোনা যায় —

''কন্যার যতেক রূপ কহন না জাএ।

চিত্রকরে চণ্ডী যেন লিখিয়া সজাএ।।

.....

কেশরী জিনিঞা মাঞ্জা হিয়া পরিসরে।

হিয়ায় না ধরে কুচ টল মল করে।।

প্রকাশ না পাএ তাতে রবির কিরণ।

হিয়ার উপরে কুঞ্চ দেখিতে সুন্দর।।

সেহিত কুঞ্চের মুখে কালবর্ণ দেখি।

কালিয়া ঢালেত যেন রজতের চাকি।।

সাগর উত্থাল কন্যা প্রথম যৌবন।

দেখিলে না রহে স্ত্রী পুরুষের মন।।''[৩৩]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৪২৬)

এভাবে দীর্ঘ আকারে নারী শরীরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়।

খোদা বখসের কাব্যের ন্যায় এই কাব্যেও জুলহাউসের রূপে মগ্ন হয়ে,

''কুলবতী নারী চলেল কুল পরিহরি।

অন্ধল সকলে চলে লাঠিভর করি।।

দেখিতে চলিল কত গর্ভবতী নারী।

নিজ ছাওয়াল কেহ দূরে পরিহরি।।

বালকেক দুগ্ধ দিতে নাহি কার মোহ।

কোন কোন যুবতী চলে হস্তে কাঁখে পোহ।।”[৩৪]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৪৫০)

নারীকূলের অবস্থার বিস্তারিত প্রকাশ এখানে ঘটেছে। দৃশ্যকল্পগুলি শুধুমাত্র পৃথক, খোদা বখসের কাব্যেও একই প্রকারের পরিস্থিতির অবকাশ ঘটেছিল।

আবার ১৯ সংখ্যক পালায় দেখা যায় ব্রাহ্মণ গাজীর প্রেমে বিহ্বল হয়ে সেকথা তার মাকে বিবৃত করে।

‘‘মোকে কিবা বল মুঞি জিয়ন্তে মরা।

পাগলিনী করি মোকে থুইয়া গেল চোরা।।

তাহার অনলে পোড়ে আমার শরীর।

ধক ধক করে প্রাণ হএত বাহির।।

কহিতে চোরার কথা জ্বলএ অগনি।

ত্রিভুবনে আমা সমান নাহি অভাগিনী।।”[৩৫]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৫১৮)

প্রেমে জর্জরিত চম্পাবতীর আকুতির মধ্যে কোথাও যেন পদাবলী সাহিত্যের রাধার প্রতিবিম্ব লক্ষ করা যায়। পূর্বরাগের রাধার স্বরেই যেন কথা বলে চম্পাবতী। এছাড়া আরও একটি কথা এপ্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে চম্পাবতী তার দুঃখের ধারা বিবরণী দেয় তার নিজের মাকে। মাও কন্যার দুঃখ উপলব্ধি করতে পারে। এখানে দুই প্রজন্মের নারীর বেদনা বিধুর স্বর যেন

মিলেমিশে একত্রিত হয়ে যায়।

''কান্দিয়া পড়িল কন্যা মাএর চরণে।

তুমি বিনে মোর দুঃখ আর কেবা জানে।।

মাএ ঝিএ গলাগলি করএ রোদন।

কান্দিয়া কান্দিয়া চাম্পা কহিতে বচন।।''[৩৬]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৫১৮, ৫১৯)

কিন্তু এই পালারই শেষাংশে চম্পাবতীর মায়ের সামাজিক ভীতি-সচেতন মনের বোধোদয় ঘটে। তাই সে নির্বিকার চিত্তে বলে উঠতে সক্ষম হয় —

''প্রাণ স্থির কর বাছা বুঝ আপন চিত্তে।।

বড় সাধের তুমি মোর কন্যা চম্পাবতী।

শুনিলে ব্রাহ্মণ সমাজ জাবে কুলজাতি।।

তোমাতে তাহাতে থাকে পালের লিখন।

কাহার শকতি তাকে খণ্ডাএ কোনজন।।

কার স্থানে না বলিহ থাক আরাধনে।

লিখন কপালে থাকে পাবে সেহিজন।।

একথা না বলিহ অন্য জনের পাশ।

জাতিকুল জাবে লোকের হৈবে পরিহাস।।[৩৭]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৫২০)

অষ্টাদশ শতকে উপনীত হয়েও যে জাতপাত নিয়ে সমাজের নারীরাও খুবই সচেতন ছিল তার প্রমাণই পাওয়া যায় এই কাব্যাংশের মধ্য দিয়ে।

এই শতকেরই আরেক অন্যতম মুসলিম কবি ছিলেন ফকির গরীবুল্লাহ শাহ যাকে দোভাষী পুথির আদি কবি বলা হয়। তিনি অনেকগুলি পুথি রচনা করেন তার মধ্যে ইউসুফ জোলেখা, মদন কামদেব পালা, আমীর হামজা (প্রথমাংশ), হোসেনমঙ্গল, সোনাভান উল্লেখযোগ্য।

ফকির গরীবুল্লাহ রচিত সোনাভান একটি যুদ্ধের কাহিনী সম্বলিত কাব্য। হজরত আলীর পুত্র হানিফার সঙ্গে সাহসী নারী সোনাভানের যুদ্ধের ইতিবৃত্ত এই কাব্যের মূল বিষয়বস্তু। যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে বীর হানিফা ও সোনাভানের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এক নারীর যোদ্ধা রূপ প্রদর্শনের প্রসঙ্গেই এই কাব্যের গুরুত্ব। এছাড়াও হানিফার তিনজন স্ত্রী-মল্লিকা, সমর্তবান ও জৈগুনের সঙ্গেও সোনাভান বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে — এ ঘটনাও একজন নারীর ক্ষেত্রে বিরল দৃষ্টান্ত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে বাংলা সাহিত্যে ধর্মমঙ্গল কাব্যধারায়ও নারীর বীরাঙ্গনা যোদ্ধা রূপ বহুল প্রচারিত। তৎকালীন মহিলারাও যে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রী শ্যাম পণ্ডিত ও ধর্মদাস বণিক বিরচিত ধর্মমঙ্গল বা নিরঞ্জনমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের পত্নী কলিঙ্গা, কানড়া এমনকি কালু ডোমের পত্নী লক্ষ্ম্যাও মহামদের ময়না-আক্রমণ

প্রতিহত করার জন্য বীরদর্পে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কাব্যমধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, কলিঙ্গা কানড়াকে বলে,

''কলিঙ্গা বলেন শুন কানড়া সতিনী।

তুমি রণ কৈলে রক্ষা পায় রাজধানী।।''[৩৮]

(পৃষ্ঠা - ৩৬৩, শ্রীশ্যামপণ্ডিত ও ধর্মদাস বণিক বিরচিত ধর্মমঙ্গল, রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ, পল্লীশ্রী, শান্তিনিকেতন, ২০০০)

কানড়া যুদ্ধে যেতে অসম্মত হলে রাণী কলিঙ্গাই বীরসাজে সজ্জিত হয়,

''সুন্দরী কলিঙ্গা এত বুঝিঞা অকাজ।

আপনে করেন রামা সমরের সাজ।।''[৩৯]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৩৬৪)

কালু ডোমের পত্নী লক্ষ্ম্যারও বীরাঙ্গনা রূপ কাব্যমধ্যে দেখতে পাওয়া যায়,

''মত্ত করীবর জিনি লক্ষ্ম্যার শরীর।

তাহার সম্মুখে কোন বীর নহে স্থির।।

সিংহনাদ ছাড়ে লক্ষ্ম্যা সমর ভিতর।

শব্দ শুনিআ পাত্র সভে দিল নড়।।

কেহ কেহ ডরে পড়ে ধরিঞা মেদিনী।

কেহো কালি নদীতে ডুবিঞা পিয়ে পানি।।

তরাসে তুরঙ্গ হৈতে পড়য়ে রাউত।

কুঞ্জরের পৃষ্ঠে হৈতে পড়িল মাহুত।।"[৪০]

(প্রাগুক্ত-পৃষ্ঠা - ৩৪৮)

অষ্টাদশ শতকে রচিত ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যেও একইভাবে নারীর যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী রূপ পরিলক্ষিত হয়। এই কাব্যের 'জাগরণ' পালায় দেখতে পাওয়া যায়, ময়নাগড় রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে কলিঙ্গা নিজে শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত করতে উদ্যত হয়।

''আপনি সমরে যাব যা থাকে কপালে।

হুকুম হইল বাজি সাজাতে বারালে।।

কিঙ্করী সকল বেড়ি পরম যতনে।

রচিল রানীর বেশ নানা রত্ন ধনে।।"[৪১]

(পৃষ্ঠা-২৩৬, ঘনরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, কলিকাতা, দ্বিতীয়

সংস্করণ, সন-১৩০৮ সন)

এ প্রকার যুদ্ধক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার রূপ 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের বিভিন্ন কবির রচনায় প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

গরীবুল্লাহর ইউসুফ জোলেখা কাব্যেও জোলেখা চরিত্র চিত্রণে তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকে শাহ মহম্মদ সগীর বাংলায় ইউসুফ জোলেখা রচনা করেছিলেন যা নিয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে, ঐ একই আখ্যানকে কেন্দ্র করে গরীবুল্লাহ আঠারো শতকে ইউসুফ-জোলেখা কাব্য লেখেন। কাব্যের মূল নারী চরিত্র জোলেখার রূপ বর্ণনায় কবির শিল্প - সৌকর্য লক্ষ করার মতো।

''ময়ূরের পর জিনে কেশ মাথা পরে।
রাহু যেন গ্রাসিল আসিয়া চাঁদেরে।।
ত্রিভঙ্গ নয়ন যেন খঞ্জনের আঁখি।
ভুবন ভুলাতে পারে সেই রূপ দেখি।।''[৪২]

(আজহার ইসলাম, মধ্যযুগের বাংলা
সাহিত্যে মুসলিম কবি, পৃষ্ঠা - ২১৮)

আবার সেই আনন্দ-উজ্জ্বল জোলেখা যখন ইউসুফের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ক্রন্দন করে ওঠে, তার চরিত্রের মধ্যে তখন যেন আধুনিক নারী চরিত্রের পূর্বাভাস দেখতে পাওয়া যায়।

''গুম হইয়া কাঁদে বিবি ভাবিয়া রব্বানী।
অঝোর নয়নে কাঁদে চক্ষে বহে পানি।।
কি বুদ্ধি কুবুদ্ধি মোর কপালের লেখা।
বঞ্চিত করিলে প্রিয় মোরে দিয়া দেখা।।''[৪৩]

(মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ, সম্পাদনা

- আহমদ শরীফ, পৃষ্ঠা - ২৩৪)

জোলেখার এই উচ্চারণ যেন আধুনিক উপন্যাসের নারীর সমলক্ষণাক্রান্ত তা স্বীকার না করে পারা যায় না।

আঠারো শতকের মুসলিম কবির কাব্যে নারীর অবস্থান নির্ণয়ের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে আরও একজন কবির নামোল্লেখ করতেই হয়, তিনি হলেন সৈয়দ হামজা। এই কবিও ফকির গরীবুল্লাহর মতোই দোভাষী পুথি রচনা করতেন। এমনকি অনেকক্ষেত্রে তিনি গরীবুল্লাহকেই অনুসরণ করেছেন। হিন্দী কবি মনঝন রচিত মধুমালতী কাব্য বাংলায় প্রথম লেখেন মুহম্মদ কবীর। এই কাব্যই পরবর্তী সময়ে সৈয়দ হামজা পুনরায় রচনা করেন। এ কাব্যে মধুমালতীর রূপ বর্ণনায় কবি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন —

''সহজে রূপের ভরে আপনি চলিতে নারে,

নবীন যৌবন তাহে ভার।।

রূপের মুরারি বালি খ্যান মধ্যে পড়ে ঢলি,

কেমনে বহিবে অলঙ্কার।।

চন্দ্রের জিনিয়া রূপ সূর্যের যেমন ধূপ,

আভরণে কিবা প্রয়োজন।।[৪৪]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ২৫১)

এছাড়া ফকির গরীবুল্লাহর অসমাপ্ত কাব্য 'আমীর হামজা'র দ্বিতীয় খণ্ড সৈয়দ হামজা রচনা করেছিলেন। এই কাব্য রোমান্স ধর্মী। এতেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে নারীর অবস্থান লক্ষ করা যায়। একাধিক নারী কাব্যের নায়ক হামজার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অবশ্য হামজাও একইভাবে বিভিন্ন নারীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে। 'হামজার প্রতি করুণ-ভগ্নীর প্রেমানুরাগ' এর কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করা হল —

''বিবি বলে শুন বাবা তামাম দরওয়ান।
নেকালিয়া দেহ মুঝে আমির পাহালওয়ান।।
যেদিন খালাস হবে পাহালওয়ান আমির।
খুব ভাতে নেওয়াজিব সবার খাতির।।
.....
খেদমত করেন বিবি আমির হামজার।
বহুত মেহের করে বহুত পেয়ার।।[৪৫]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ২৬৪)

এখানে দেখা যায় নারীর সোচ্চার প্রণয় - অভীপ্সা। চিরাচরিত সমাজ অনুশাসিত কুণ্ঠা নয়, দ্বিধাহীন কণ্ঠস্বরেই প্রেমের প্রতি তার অঙ্গীকার।

এই কবিরই রচিত 'হাসেন বানুর সাত সওয়াল' এও দেখতে পাওয়া যায় আরেক নারীর একের পর এক প্রশ্নবান হাতেম তাইকে। পুরুষকে এভাবে প্রশ্ন করবার অধিকার

নারীর সচরাচর থাকে না। যখন বিবিকে বলতে শোনা যায়,

''বিবি বলে চাহারম সওয়াল আমার।

এক মর্দ্দ এই কথা কহে বারবার।।

সাচ্চা কথা যে বলে হামেশা খোশ থাকে।

রাস্ত বাতে লোক কভু নাহি পড়ে পাকে।।'' [৪৬]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ২৫৬)

সত্যিই তো সত্যের পথে যে থাকে তার আনন্দ চিদানন্দের সমরূপ, একথা একজন নারীর কণ্ঠেই ধ্বনিত হতে পারে। সমাজের নানাপ্রকার অবহেলা, বঞ্চনা, শোষণের স্বীকার হয়েও নারীই সত্য অন্বেষণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে থাকতে পারে - উপরিউক্ত পংক্তিসমূহ যেন সেই সত্যেরই সন্ধান দেয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট মুসলিম বৈষ্ণব কবি ছিলেন আলী রাজা ওরফে কানু ফকির। ডক্টর আহমদ শরীফের মতানুসারে ''আলি রাজা ছিলেন গৃহী দরবেশ। পীরালি ছিল তাঁর পেশা।'' তাঁর রচিত অজস্র পদাবলী পাওয়া যায় —

''কুলবতী যত নারী গৃহবাস দিল ছাড়ি

শুনিয়া দারুণ বংশীস্বর।

জাতিধর্ম কূলনীতি তেজিব দুর্লভ পতি,

নিত্য শুনে মুররীর গীত।''[৪৭]

(বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান

কবির পদমঞ্জুষা, পৃষ্ঠা ৫১)

কিম্বা

''কালা তোমা ভাল জানি,

তোমার সঙ্গে প্রেম করি হৈলুম কলঙ্কিনী''[৪৮]

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৪৬)

এসব পদের মাধ্যমেও রাধার বয়ানে নারীর স্বর শুনতে পাওয়া যায়।

এছাড়াও আঠারো শতকের কবি মুহম্মদ হারী পণ্ডিতের কাব্যে জয়গুণের বারমাসী ও মুহম্মদ আলী রাজা রচিত 'তমিম গোলাল চতুর্ণ ছিল্লাল' এ কুমারীর খেদ (বারমাসী) অংশেও নারীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়।

আধুনিক নারীবাদ সম্পর্কিত ধারণা তৈরি হওয়ার অনেক আগে রচিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের মুসলিম কবির লেখা এই কাব্যসমূহ। এইসব কবিদের মধ্যে সামাজিক লিঙ্গ (Gender) সচেতনতাবোধ এক প্রকার ছিল না বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। অধুনা নারীবাদ (উদারপন্থী নারীবাদ, প্রগতিশীল নারীবাদ, তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদ প্রভৃতি ভিন্ন শ্রেণী) আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে নারীর কণ্ঠস্বর (Voice) কীভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আস্তে আস্তে হারিয়ে যেতে থাকে। এই নারীবাদী তত্ত্ব জিজ্ঞাসা থেকেই আমরা যদি অষ্টাদশ শতকে ফিরে গিয়ে পূর্বালোচিত কাব্যগুলিকে সচেতনভাবে

নিরীক্ষণ করি, তাহলে কতটা শুনতে পাই নারীর প্রান্তিক স্বর? এর সদুত্তর অন্বেষণের প্রচেষ্টাই করা হয়েছে এখানে। গণিতের মতো মীমাংসা প্রত্যাশা করা ঠিক নয়, তবে এটুকু হলফ করে বলা যেতেই পারে মুসলিম কবিদের কাব্যে নারীরা ভিন্নমাত্রিক রূপ পরিগ্রহণ করে যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হতে পেরেছিল।

তথ্যপঞ্জী

১. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৭৫), পৃষ্ঠা ৩১৫ (Secondary reference)

২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫১ (Secondary reference)

৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫৩ (Secondary reference)

৪. রাজিয়া সুলতানা, নওয়াজীস খান ও গুলে বকাওলী কাব্য, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩৭২), পৃষ্ঠা ১০৫

৫. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, (ঢাকা : খান ব্রাদার্স, ডিসেম্বর ২০০৬), পৃষ্ঠা ৩৪০

৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩৯

৭. আহমদ শরীফ সম্পাদিত মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ, (ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০০২), পৃষ্ঠা ২৪৮

৮. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, অন্নদামঙ্গল কাব্য, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪০৪), পৃষ্ঠা ২৮৩

৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮৪

১০. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩৯

১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩৯

১২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪০

১৩. ডক্টর মহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, এপ্রিল ২০০১), পৃষ্ঠা ১৩৮

১৪. বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭২, পৃষ্ঠা ৪০, ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩৬ (Secondary reference)

১৫. আজহার ইসলাম, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, আষাঢ়, ১৩৯৯), পৃষ্ঠা ২৪৪

১৬. সাহিত্য প্রবেশিকা, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক শ্রী প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা ১

১৭. এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১১

১৮. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, দ্বিতীয় খণ্ড, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৮০), পৃষ্ঠা ৬০৬

১৯. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত, বাংলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান, (ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮), পৃষ্ঠা ১৫৫

২০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬৯

২১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬৯

২২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭৩

২৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৬

২৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৪

২৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৫

২৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৫

২৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৬

২৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৭

২৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০১

৩০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০৭

৩১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০৯

৩২. সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৌষ, ১৪০০) পৃষ্ঠা ৭৩

৩৩. গাযী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪২৬

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫০

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫১৮

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫১৮,৫১৯

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫২০

৩৮. শ্রী শ্যাম পণ্ডিত ও ধর্মদাস বণিক বিরচিত ধর্মমঙ্গল (নিরঞ্জন মঙ্গল), ড: সুমিত্রা কুন্ডু সম্পাদিত, (শান্তিনিকেতন : রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ, ২০০০), পৃষ্ঠা ৩৬৩

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬৪

৪০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪৮

৪১. ঘনরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত শ্রী ধর্ম্মমঙ্গল, (কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩০৮ সন), পৃষ্ঠা ২৩৬

৪২. আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১৮

৪৩. মধ্য যুগের কাব্য - সংগ্রহ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৪

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫১

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬৪

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৬

৪৭. বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা, শ্রী যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪), পৃষ্ঠা ৫১

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬

উপসংহার

পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মুসলিম কবিদের কাব্যে নারীর অবস্থান যথাযথ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই চার শতকের কাব্যে নারী চরিত্রের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণই এই গবেষণা সন্দর্ভের মূল উপজীব্য। কাব্যগুলির অন্তরঙ্গ পাঠ নির্মাণের মাধ্যমে বোঝার প্রচেষ্টা করা হয়েছে যে তৎকালীন সামাজিক প্রতিবেশে মুসলিম কবিরা কিভাবে তাঁদের কাব্যে নারীর কণ্ঠস্বরকে শুনতে চেয়েছেন। সমসাময়িক কালে রচিত মঙ্গল কাব্যে, অনুবাদ সাহিত্যে প্রতিফলিত নারীর গতানুগতিক অবস্থান থেকে কী প্রকারে এই কাব্যগুলির নারী চরিত্ররা ভিন্ন মেজাজের হয়ে উঠেছে, তা অনুসন্ধানেরও প্রয়াস করা হয়েছে এই গবেষণাপত্রে। কাব্যরচনার ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা কাব্য উৎসের অনুসরণই কি এই ভিন্নমাত্রিক নারী চরিত্রের সৃষ্টি করেছে? এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানেরও যথাসম্ভব প্রচেষ্টা করা হয়েছে। অনেক সময়ই দেখা গেছে মুসলিম কবিরা কোনো রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে, রাজার আনুকূল্যে কাব্যরচনায় নিবিষ্ট হয়েছেন। এঁদের সৃষ্ট নারী চরিত্ররা কি সামাজিক নানা বিপন্নতা ও বিধিনিষেধ থেকে স্বাভাবিকভাবেই মুক্তি পেয়েছে? আবার সুফী ধর্মভাবনা ও দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন অধিকাংশ মুসলিম কবিরা। সুফী ভাবনার মূল নির্যাস, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনের আকুতি কাব্যকাঠামোর অন্তরালে উপস্থিত ছিল বলেই কি নারী চরিত্রগুলি তারই দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল? শরীয়তী ইসলামের বিধিনিষেধের স্পর্শ থেকে মুক্ত ছিলেন এই সুফী ধর্মমতালম্বী

কবিরা। সেই মরমিয়া ভাবধারার দ্বারাই কি চালিত হয়েছিল তাঁদের সৃষ্ট চরিত্ররা? এই নানাবিধ উত্তরের অণ্বেষণ করা হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, সুফী ধর্মের আশেক মাশুক তত্ত্বের সাহিত্যিক প্রতিচ্ছায়া এসে পড়েছে কাব্যগুলির উপর। সামাজিক বাস্তবতা বিবর্জিত হয়েই জীবাত্মা-পরমাত্মার দ্যোতক হিসেবে কাব্যের চরিত্রগুলি গঠিত হয়েছে। কাব্যগুলির উৎসকাব্যও অনেক সময়ই আরবী ফারসী বা হিন্দী অবধী ভাষায় রচিত অন্য কোনো কাব্য। কাব্য নির্মাণ পরিকল্পনার পার্থক্যের কারণেই হিন্দু কবিদের রচিত কাব্য থেকে ভিন্ন স্বাদে নির্মিত হয়ে উঠেছে মুসলিম কবিদের দ্বারা রচিত কাব্যসমূহ। এই ধরণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক নানাবিধ আঙ্গিকের আবর্তে আবর্তিত হয়েছে এই গবেষণা সন্দর্ভ।

গবেষণা পত্রটি ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বোঝার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যেকোনো সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করতে গেলে তার সমসাময়িক কালচিহ্নকে বুঝে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। এই তাগিদ থেকেই প্রথম অধ্যায়টির অবতারণা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে ইসলামের শরীয়ত, মরীফত দর্শন ও তার প্রভাব কিভাবে কাব্যগুলিতে এসে পড়েছে, তা নিয়ে। সুফী ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত মুসলিম কবিরা এই মরমিয়া দর্শনকে রূপকের মাধ্যমে কিভাবে কাব্যে স্থান দিয়েছেন, মূলত তা অনুসন্ধান করাই এই অধ্যায়ের উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যথাক্রমে পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের কাব্যে উপস্থিত নারীচরিত্রের ভিন্নমাত্রিক বয়ান নির্মাণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ দিয়ে অনেক সময় বিচার বিশ্লেষণ করলেও তা কখনো অপ্রাসঙ্গিকভাবে আরোপ করা হয়নি। সব ধরনের সামাজিক, সাহিত্যিক সমস্যার অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে নারীর অবস্থানের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

মধ্যযুগের প্রেক্ষিতে রচিত হলেও মুসলিম কবিদের কাব্যের নারীচরিত্ররা কিভাবে তাদের স্থান ও কালের সীমাবদ্ধতায় থেকেও যুগোত্তীর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে তা অনুসন্ধানের জন্যই এই অভিসন্দর্ভের অবতারণা। মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের একটিমাত্র শাখার আলোচনা এই গবেষণার পরিধি। কিন্তু সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারীর অবস্থানকে চিহ্নিত করে এই ধরনের গবেষণা হওয়া সম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জী

১. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা : প্যাপিরাস, ১৯৬৪

২. আলম, রশীদুল, সূফী সাধনার ভূমিকা, ঢাকা : আয়েশা কিতাব ঘর, ২০০২

৩. আলাওল, পদ্মাবতী, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ফেব্রুয়ারী ২০০২

৪. আহমদ, ওয়াকিল, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ঢাকা : খান ব্রাদার্স, ডিসেম্বর ২০০৬

৫. ইসলাম, আজহার, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, আষাঢ় ১৩৯৯

৬. কাজি, দৌলত, লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না, সম্পাদনা দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ২০০৬

৭. খানম, মাহমুদা, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সুফী কাব্যের প্রভাব, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুন ২০০৩

৮. খাঁ, দৌলত উজির বাহ্‌রাম, লায়লী মজনু, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, নভেম্বর ২০০৬

৯. গাজী, দোনা, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

১০. গিরি, সত্যবতী ও সনৎকুমার নস্কর সম্পাদিত, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গবেষণা পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফাল্গুন-শ্রাবণ ১৪০৯

১১. ঘোষ, শঙ্খ, কবিতা সংগ্রহ, ১, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০৯

১২. চক্রবর্ত্তী, ঘনরাম, শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা : শ্রী অরুণোদয় রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩০৮ সন

১৩. চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার, চর্যাগীতির ভূমিকা, কলকাতা : ডি. এম লাইব্রেরী, ডিসেম্বর ১৯৯৫

১৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দ, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, সম্পাদনা সনৎকুমার নস্কর, কলকাতা : রত্নাবলী, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

১৫. চৌধুরী, প্রমথ, প্রবন্ধ সংগ্রহ, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, জুন ২০১০

১৬. জায়সী ও আলাওল, পদ্মাবতী, সম্পাদনা দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আগষ্ট ২০০৯

১৭. ঠাকুর, কোরেশী মাগন, চন্দ্রাবতী, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, ঢাকা : সূচীপত্র, ডিসেম্বর ২০০৮

১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৪০৬

১৯. দত্ত, মধুসূদন, বীরাঙ্গনা কাব্য, কলকাতা : ঊষা পাবলিশিং হাউস, প্রকাশকালের উল্লেখ নেই।

২০. পণ্ডিত, শ্যাম, ধর্মদাস বণিক, ধর্মমঙ্গল (নিরঞ্জনমঙ্গল), ড. সুমিত্রা কুণ্ডু সম্পাদিত, শান্তিনিকেতন : রাঢ়-গবেষণা পর্ষদ, ২০০০

২১. পবিত্র কুরআন, বাংলা অনুবাদ, কলকাতা : বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, মে ২০১২

২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০১

২৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯-২০০০

২৪. বরকতুল্লাহ, মোহাম্মদ, পারস্য প্রতিভা, ঢাকা : গ্রেট ইস্ট লাইব্রেরী, ১৯৬৫

২৫. বড়ু চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ১৯৯৯

২৬. বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭২

২৭. বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন), শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রী সুকুমার সেন, শ্রী বিশ্বপতি চৌধুরী, শ্রী শ্যামাপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত, কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯

২৮. ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহন, বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা, কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪

২৯. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, কলকাতা : এন বি এ, জুলাই ২০১০

৩০. মওদুদী, সাইয়েদ আবুল আ'লা, ইসলামের হকীকত, কলকাতা : বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, অক্টোবর ২০১২

৩১. মনসুরউদ্দিন, মুহম্মদ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ১ম খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫

৩২. যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ সম্পাদিত, বাংলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান, ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮

৩৩. রায়গুণাকর, ভারতচন্দ্র, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪০৪

৩৪. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৮০

৩৫. শরীফ, আহমদ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩

৩৬. ———, বাঙলার সূফী সাহিত্য, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০১১

৩৭. ———, মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০০২

৩৮. শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ, বাংলা সাহিত্যের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যযুগ, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, এপ্রিল ২০০২

৩৯. সগীর, শাহ মুহম্মদ, ইউসুফ জোলেখা, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, নভেম্বর ১৯৯৯

৪০. সাহিত্য প্রবেশিকা, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক শ্রী প্রবোধচন্দ্র বাগচী, বিশ্বভারতী

৪১. সাংকৃত্যায়ন, রাহুল, ইসলাম ধর্মের রূপরেখা, অনুবাদ মলয় চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, মার্চ ২০০৯

৪২. সুলতানা, রাজিয়া, আবদুল হাকিম কবি ও কাব্য, ঢাকা : বাংলা একাডেমী

৪৩. ———, নওয়াজিস খান ও গুলে বকাওলী কাব্য, ঢাকা : বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩৭২

৪৪. সেন, দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আগষ্ট ২০০২

৪৫. ———, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আগষ্ট ২০০২

৪৬. সেন, রুশতী, প্রচ্ছন্নের আখ্যান, কলকাতা : থীমা, ২০০২

৪৭. সেন, সুকুমার, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৌষ ১৪০০

৪৮. ———, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ, নবম মুদ্রণ, ২০০৯

৪৯. ———, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৭৫

৫০. হক, মুহম্মদ এনামুল, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, এপ্রিল ২০০১

৫১. হোসেন, রোকেয়া সাখাওয়াৎ, রোকেয়া রচনাবলী, ঢাকা : বর্ণায়ন, ২০১০

সহায়ক গ্রন্থাবলী

৫২. আলা, মওদুদী সাইয়েদ আবুল, পর্দা ও ইসলাম, কলিকাতা : বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, জানুয়ারি ১৯৯৭

৫৩. আহমদ, ওয়াকিল, বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৩

৫৪. ইসলাম, আমিনুল, ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম দর্শন, ঢাকা : উত্তরণ, জুন ২০০৪

৫৫. কুতুব, মোহাম্মদ, ইসলাম ও নারী, কলকাতা : ষষ্ঠ প্রকাশ, ২০১২

৫৬. গুপ্ত, ক্ষেত্র, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, কলকাতা : গ্রন্থনিলয়, জুলাই ২০০৬

৫৭. জলিল, মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জানুয়ারি ১৯৯৬

৫৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, বাঙ্গালার ইতিহাস, অখণ্ড সংস্করণ, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর ২০১২

৫৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা, মঙ্গলকাব্যে নিম্নবর্গের অবস্থান, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৯

৬০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, কলিকাতা : সরস্বতী লাইব্রেরী, চৈত্র, ১৩৫৩

৬১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলকাতা : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, মে ২০১৫

৬২. ভট্টাচার্য, বীতশোক, সুবল সামন্ত সম্পাদিত, আরব্য রজনী, কলকাতা : এবং মুশায়েরা, জানুয়ারী ২০০৪

৬৩. মাওলানা, আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, ইসলামের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৮

৬৪. মৈত্র, শেফালী, নৈতিকতা ও নারীবাদ, কলকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নভেম্বর ২০০৩

৬৫. রহমান, তরফদার মমতাজুর, বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী - হিন্দী পটভূমি, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯

৬৬. রহীম, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর, নারী, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, মে ২০০৮

৬৭. রায়, অনিরুদ্ধ, রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি, কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১২

৬৮. শরীফ, আহমদ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৬

৬৯. সান্যাল, অবন্তীকুমার, ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব, কলকাতা : সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯৯৫

৭০. সেন, সুকুমার, বাংলার সাহিত্য - ইতিহাস, কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমী, ২০১৫

৭১. হালদার, গোপাল, বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড, প্রাচীন ও মধ্যযুগ, কলিকাতা : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রাবণ ১৩৬৩

ইংরাজী গ্রন্থাবলী

৭২. A'la, Maududi, Towards Understanding Islam, New Delhi : Ma Kazi Maktaba Islami Publishers, October 2012

৭৩. Angelou's, Maya, I Know Why the Caged Bird Sings, Edited Harold Bloom, Delhi : Viva Books Private Limited, 2007

৭৪. Darwin, Charles, On The Origin of Species By Means of Natural Selection, London : John Murray, Albemerle Street, 1859

৭৫. Donovan, Josephine, Feminist Theory, New York : Continuum, 1977

৭৬. Elliot, H and T. Dowson, The History of India as told by its Own Historians, London : 1867-77, 8 Vols., Vol III

৭৭. Engels, Frederick, The Family, Private Property and the State, Zurich : Hottenzen, 1884

৭৮. Feminism in Literature, Edited by Jessica Bomarito, Jeffrey W. Hunter, Vol. 1, Gale Centage, 2005

৭৯. Feminist Readings / Feminists Reading, 2nd Edition, Sara Mills and Lynne Pearce, Europe : Prentice Hall, 1996

৮০. Foucault, Michel, Power / Knowledge : Selected Interviews and Other Writings, Brighton, 1980

৮১. Freedman, Jane, Feminism, New Delhi : Viva Books Private Limited, 2002

৮২. Geetha, V., Gender, Kolkata : Stree, 2002

৮৩. Journal of the History of Ideas, Vol. 61, No. 2, University of Pennsylvania Press, April 2000

৮৪. Kate, Milett, Sexual Politics, New York : Avon, 1971

৮৫. Panjabi, Kavita, Poetics and Politics of Sufism and Bhakti in South Asia, Kolkata : Orient Blackswan, 2011

৮৬. Sangari, Kumkum, Sudesh Vaid, Recasting Women, Essays in Colonial History, Delhi : Kali for Women, 1999

৮৭. Shah, Idries, The Sufi Mystery, Edited by Nathaniel P. Archer, Delhi : Rupa & Co, 2007

৮৮. Shakespeare, William, Macbeth, shakespeare.mit.edu, 1606

৮৯. Tuttle, Lisa, Encyclopedia of Feminism, Harlow : Longman, 1986

৯০. Vatsayana, The Kamasutra, translated by Sir Richard F. Burton, Delhi : Jaico Publishing House, 1976